প্রকাশনা-১৭

মুদ্রণ-১

باسمه سبحانه تعالى

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

"যে মহিলা এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, তাহলে সে জান্নাতে যাবে।"

–তিরমিযী শরীফ, ১ঃ২১৯

আদর্শ স্ত্রীর পথ ও পাথেয়

সংকলন, অনুবাদ, গ্রন্থনা, সম্পাদনা

মাওলানা মুফতী রূহুল আমীন যশোরী

সিনিয়র শিক্ষক, জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া

সাত মসজিদ মাদ্রাসা ভবন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ইমাম ও খতীব, নূরে মুহাম্মদী জামে মসজিদ

পশ্চিম কাটাশুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন ঃ ৮১১৩৬৯০, ৮১১৮৮৭৩

মোবাইল ঃ ০১৭২-৭৫৩০১৩

পরিবেশনায়

কোহিনূর লাইব্রেরী

৫০, বাংলা বাজার, ঢাকা।

প্রারম্ভিক কথা

কোটি কোটি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা মহা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি, মহামহিম, আল্লাহ তা'আলার, যিনি এ অধমের দ্বাদশ গ্রন্থ "আদর্শ স্ত্রীর পথ ও পাথেয়" প্রকাশ করার তৌফিক দিলেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম তাঁর সর্বাধিক প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর।

গ্রন্থটি ঐ সকল গৃহবধূদের জন্য লিখিত, যারা সংসার-ধর্ম নিয়ে বড় বিচলিত ও চিন্তিত থাকে। যারা স্বামী নিয়ে, শাশুড়ী নিয়ে, ননদ নিয়ে পড়েছে মারাত্মক বিপাকে। তাদের দুশ্চিন্তা দূর করে গৃহ কাননকে আনন্দময় বানানোর জন্য একজন স্ত্রীর কি বরণীয়, কি করণীয়, কি বর্জনীয় তার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে এ গ্রন্থে। যদি কোন স্ত্রী এ গ্রন্থে লিখিত দিক নির্দেশনার উপর আমল করে, তাহলে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার সংসারকে জান্নাতের নমুনা বানিয়ে দিবেন। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পিয়ার-মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে হবে দৃঢ় মজবুত, অটুট ও শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনটাই পারস্পরিক সম্পর্ক আজীবন দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার জন্য।

এ গ্রন্থ রচনায় সর্বাপেক্ষা উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি এ উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ বহুগ্রন্থ প্রণেতা **হযরত মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দ শহরী (রাহঃ)** কর্তৃক লিখিত "তোহ্ফায়ে খাওয়াতিন" নামক গ্রন্থ ও তার মুখ নিঃসৃত নারী বিষয়ক একটি মূল্যবান উর্দ্দু বয়ান থেকে, যা সংকলন করেছেন মাওলানা কাসেম জিয়া চিবইয়ানবী সাহেব (পাকিস্তান)। বয়ানটির নামকরণ করা হয়েছে "মুমিন আওরাত কে আউসাফ আওর যিম্মেদারিঁউ কা বয়ান"। আমি এ বয়ানের বঙ্গানুবাদ করেছি। অধিকন্তু "নব বধূর উপহার", "নারী জন্মের আনন্দ" ও "মহর"সহ অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বয়ান সংযোগ করে তাঁর বয়ানকে অলংকৃত করেছি। যার সমষ্টি পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সোনায় সোহাগারূপে বিবেচিত হবে, ইন্‌শাআল্লাহ। ত্রুটি অন্বেষণের নিয়্যতে নয়; বরং আমলের নিয়্যতে পাঠ করলে উপকার হবে আশাকরি।

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম স্ত্রীদের সমীপে **"আদর্শ স্ত্রীর পথ ও পাথেয়"** গ্রন্থখানা যথাসম্ভব বিশুদ্ধতার সাথেই পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। তারপরও গ্রন্থটির মধ্যে যদি কোন বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার নজরে কোন অসংলগ্নতা ধরা পড়ে, তবে তা আমাকে অবহিত করে সংশোধনের সুযোগ দিলে কৃতার্থ হব।

পরিশেষে সকল মুমিন-মুমিনাতের নিকট সবিনয় দু'আ প্রার্থনা করি, মহামহিম আল্লাহ যেন অধমের অন্তরে ইখলাস পয়দা করে দেন এবং এ নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনা কবুল করেন। যারা গ্রন্থটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে প্রকাশ করার জন্য সহযোগিতা, মেধা ও শ্রম নিয়োগ করেছেন, তাঁদের সকলের জন্য রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও দু'আ।

১লা রজব ১৪২৪ হিজরী
জামিআ রাহমানিয়া, সাতমসজিদ মাদ্রাসা
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

বিনীত
রুহুল আমীন যশোরী

সূচীপত্র

তাকওয়ার পর সর্বাপেক্ষা উত্তম জিনিষ সতী নারী

হযরত মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দ শহরী (রাহঃ) এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসের অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হুজুর (সাঃ)-এর বাণী বর্ণনা করেন, মুমিন বান্দা খোদাভীরুতা অর্জনের পর নিজের জন্য সবচেয়ে উত্তম বস্তু যা সে নির্বাচন করে, তা হল নেকবখত স্ত্রী। যার গুণ এমন, স্বামী যখন তাকে কোন কাজের আদেশ দেয়, তখন তা পূর্ণ করতে স্বামীকে সহযোগিতা করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদের হিফাজত করে। -মিশকাত, ২৬৮

হযরত বুলন্দ শহরী (রাঃ) উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন, উক্ত হাদীস শরীফে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তাকওয়ার নিয়ামত একটি অনেক বড় নিয়ামত। যদি কেউ এ মহা মূল্যবান নিয়ামত সহজেই প্রাপ্ত হয়, তাহলে সে বড় ভাগ্যবান, বরকতময় ব্যক্তি। কেননা, প্রকৃত দ্বীনদারী তাকওয়ারই নাম। এর কারণ এই যে, তাকওয়া হল ফরয, ওয়াজিব আদায় করা এবং হারাম, মকরূহ ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকার নাম। ঐ গুণ অর্জন করতে পারলে বান্দা আল্লাহ তা'আলার প্রিয় পাত্র হয়ে যায়।

তাকওয়া ব্যতীত আরো অসংখ্য নিয়ামত এমনও রয়েছে, যার স্তর যদিও তাকওয়ার নিয়ামত থেকে কম। কিন্তু মানব জীবনের জন্য সেটাও অনেক জরুরী ও অমূল্য। ঐ সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে সবচে' মূল্যবান নিয়ামত কি? তা মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, তাহল নেক ও সতী

স্ত্রী। অতঃপর তিনি নেক ও আদর্শ স্ত্রীর গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন ঃ

১ম গুণ ঃ স্বামীর অনুগত, বাধ্যগত হওয়া। স্বামী যা আদেশ করেন, তা পূর্ণ করে এবং নাফরমানী করে স্বামীর অন্তরকে ব্যাথিত করে না। শর্ত হল, স্বামী তাকে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের আদেশ দেয় না। কেননা, শরীয়ত বিরোধী কাজে কারো আনুগত্য হারাম। কারণ, এতে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী হয়, যিনি রাজাধিরাজ, বিশ্ববিধাতা।

২য় গুণ ঃ নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, যদি স্বামী স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তাহলে স্ত্রী স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দেয়। অর্থাৎ স্ত্রী তার ঢং, সাজ-সজ্জা, রূপচর্চা স্বামীর মরজী মুতাবেক করে। যখন স্বামীর দৃষ্টি স্ত্রীর চেহারায় পড়ে, তখন তাকে দেখে স্বামীর অন্তর সন্তুষ্ট হয়ে যায়। কোন কোন নির্বোধ নারী অশালীন আচরণ করে। কথায় কথায় মুখ বক্র করে। অসুস্থতা প্রকাশের জন্য খামোখা কোকাতে থাকে। রূক্ষ মেজাজ প্রদর্শন করে। কোন কোন স্ত্রী অগোছানো কেশে অপরিচ্ছন্ন বেশে কাজের বুয়ার মত স্বামীর সম্মুখে ঘোরাফেরা করে। এতে স্বামী মানসিকভাবে ক্লীষ্ট এবং আন্তারিকভাবে ক্ষিপ্ত হতে থাকে। স্বামী এমন স্ত্রীর চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করাও অপছন্দ করে; বরং বাইরে থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করাও মুসীবত মনে করে। এদের মধ্যে ঐ সব নারীরাও রয়েছে, যারা নমায রোজার পাবন্দ হওয়ার কারণে নিজেদেরকে নেককার, দ্বীনদার, পরহেজগার মনে করে, অথচ নেককার ও আদর্শ স্ত্রীর গুণাগুণের মধ্যে এ গুণটিও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যে, সে স্বামীর অনুগত্য, বাধ্যগত হবে এবং স্বামী তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দেবে। তবে শরীয়ত বিরোধী খাহেশ পূর্ণ করবে না। এটা জায়েয নেই।

৩য় গুণ ঃ নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, স্বামী যদি কছম খায় (শপথ করে) কোন কাজ করার, যার সম্পর্ক ইহলৌকিক বা পারলৌকিক, যেমন- আজ তুমি অবশ্যই আমার মায়ের বাড়ি বেড়াতে যাবে অথবা বড় ছেলেকে গরম পানি দ্বারা গোছল করাবে কিংবা আজ তুমি তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, তাহলে স্ত্রী স্বামীর শপথকে সত্যে পরিণত করে। অর্থাৎ স্বামী যে কাজের শপথ করে, সে কাজ করে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে। তবে শর্ত হল, সে কাজ শরীয়ত সম্মত হতে হবে। অন্যথায় স্বামীর কছম পূর্ণ করলে গুনাহগার হবে।

লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, স্বামী কর্তৃক এভাবে কছম খাওয়া যে, "তুমি কিন্তু এ কাজটি অবশ্যই করবে", স্ত্রীর প্রতি অধিক প্রেম-ভালবাসার কারণেই হয়ে থকে। যার সাথে গভীর সুসম্পর্ক এবং যার উপর অধিকার চলে, তাকেই বলা যেতে পারে, "এ কাজ তোমাকে করতেই হবে।" এমন পরিস্থিতিতে কোন কোন সময় স্বামী স্ত্রীকে কছম দিয়ে থাকে। কখনও কখনও স্বয়ং স্বামী নিজেও কছম খেয়ে থাকে। যে সব স্ত্রীদের সাথে স্বামীদের আন্তরিক ও অকৃত্রিম ভালবাসা ও সুসম্পর্ক রয়েছে, তারাই কেবল স্বামীদেরকে সন্তুষ্ট রাখার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখে। উল্লেখিত তৃতীয় গুণ বর্ণনায় ঐ বিশেষ প্রেম-ভালবাসা, দাবী ও চাহিদা আলোচিত হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪র্থ গুণ ঃ নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, যদি স্বামী কোথাও চলে যায় এবং স্ত্রীকে গৃহে রেখে যায়, যেমনটি অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে, তখন স্ত্রীর কর্তব্য এই যে, স্বীয় জীবন, যৌবন এবং স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণে ঐ পন্থা অবলম্বন কবরে, যে পন্থা সে স্বামীর উপস্থিতিতে করে। আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্ন স্বামীরা কখনও এটা পছন্দ করবে না যে, তার স্ত্রী অন্য কোন বেগানা পুরুষকে দেখুক বা বেগানা পুরুষের সম্মুখে আসুক কিংবা পর-পুরুষের চোখে চোখ রেখে হাসুক অথবা মন বিনিময় করুক। যখন স্বামী গৃহে উপস্থিত থাকে, তখন সে একান্ত তারই স্ত্রী হয়ে থাকে। আর যখন স্বামী কোন কাজে বাইরে চলে যায়, তখনও একমাত্র তারই স্ত্রীরূপে গৃহে পর্দানশীন হয়ে অবস্থান করে। যখন কোন পুরুষের সাথে বিবাহ হয়ে গেল, তখন চারিত্রিক পবিত্রতা ও সতীত্ব সংরক্ষণ ঐ পুরুষ (স্বামী) এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল। এখন স্ত্রী মানসিক ও মানবিক কামনা-বাসনা পূর্ণ করার কেন্দ্রস্থল একমাত্র স্বামীকেই বানিয়ে নেবে, অন্য কাউকে নয়। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে এক রকম আচরণ, আর তার অনুউপস্থিতিতে অন্য রকম। যেমন ঃ তার টাকা-পয়সা লুটিয়ে দেবে অথবা মায়ের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ব্যয় করবে। যদি স্বামীর অনুপস্থিতিতে অথবা তার অনুমতি ব্যতীত তার ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা অপচয় করে, তাহলে তা হবে খিয়ানত ও স্বামীর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা। যেমন ঃ একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

لا تبغيه خونا فى نفسها ولا ماله- المشكوة صـ٢٨٣

একটি প্রশ্ন তার ও তার উত্তর

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, আমাদের সমাজে কোন কোন স্বামী এমন রয়েছে, যারা স্বীয় প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে বেগানা পুরুষদের সম্মুখে উপস্থিত করে। বরং তাদের সাথে স্ত্রীকে হাত মিলাতে বলে। শুধু তা নয়, বরং পর পুরুষদের সম্মুখে নাচতে বাধ্য করে। এখন যদি ঐ সমস্ত স্বামীদের স্ত্রীগণ স্বামীর অনুপস্থিতে পরপুরুষের সাথে কুসম্পর্ক রাখে, যা স্বামীর ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদিত হয়। তাহলে তা বৈধ হওয়া উচিত? কারণ, এতে স্বামীর সাথে খিয়ানতও হয় না, বিশ্বাস ঘাতকতাও হয় না। কেননা, স্বামী তো স্বয়ং নিজেই চায় যে, তার স্ত্রী বেগানা পুরুষদের সাথে মেলা-মেশা করুক। বরং অনেক স্বামী তো এতে আনন্দিত হয়। কারণ, তারা স্বীয় স্ত্রীকে মডার্ণ দেখতে চায়। তার স্ত্রীর বয় ফ্রেন্ড অসংখ্য। এটা তো আপটুডেট হওয়ার আলামত। আনন্দিত হওয়ারই কথা? ঐ প্রশ্নের উত্তর এই যে, হাদীস শরীফে মুসলমান নারী-পুরুষের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কোন মুসলমান কখনও নির্লজ্জ ও মর্যাদাবোধহীন হতে পারে না এবং কখনও এটা বরদাস্ত করতে পারে না যে, তারই প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর উপর কোন বেগানা পুরুষের দৃষ্টি পড়ুক কিংবা হস্ত প্রসারিত হোক। আর না কোন মুমিন আদর্শ স্ত্রী এটা পছন্দ করবে যে, স্বামী ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে তার কুসম্পর্ক হোক। যারা বর্তমান আধুনা সমাজ ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চায় এবং স্ত্রীকে মডার্ণ বানানো পছন্দ করে, তারা নিঃসন্দেহে ইয়াহুদী নাছারাদের জীবন ব্যবস্থারই অনুকরণ করছে। তাদের মধ্যে কতটুকু ঈমান রয়েছে, প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সাথে তাদের কতটুকু মুহাব্বত, কুরআন হাদীসের সাথে তাদের কতটুকু ভালবাসা? যদি এসব যাচাই করা হয়, তাহলে ফলাফল দাড়াবে শূন্যের কোঠায়। এরা সহীহ মুমিন হওয়া তো দূরের কথা, সহীহ মানুষ কিনা তাতেও রয়েছে প্রচুর সন্দেহ।

উল্লেখিত হাদীস শরীফে এমন ঈমানহারা বদ নসীব মানুষের আলোচনা করা হয়নি; বরং সম্মানিত মর্যাদাবোধসম্পন্ন মুমিন নারী-পুরুষের আলোচনা করা হয়েছে।

দাইয়ূস এর জন্য হুশিয়ারী

যে সমস্ত লোকেরা স্ত্রীদের চরিত্রহীনতা মেনে নেয় এবং তাদের চরিত্র ও সতীত্ব কলঙ্কিত হওয়াতে লজ্জাবোধ করে না, তাদের সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে হারাম করেছেন (১) মদ পানকারী (২) যে মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয় (৩) যে নিজ পরিবারে অপবিত্র কাজ (যেনা ব্যভিচার নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, মেয়েদের অবাধে মেলা-মেশা ইত্যাদি) কে সমর্থন করে ও স্থায়ী রাখে। -মুসনাদে আহমদ

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, স্বামীর আনুগত্য শরীয়ত সমর্থিত কাজের মধ্যে নন্দিত। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজে কারো আনুগত্য, অনুকরণ ও অনুসরণের অনুমতি নেই। যদি স্বামী বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করতে বলে, তবুও বেপর্দা হওয়া জায়েয নেই।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

ঈমানের ব্যাপারে স্বামীকে সাহায্য করা

পূর্বে উল্লেখিত হাদীস সমূহে নেককার স্ত্রীর কতক গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছিল। অন্য একটি হাদীসে আরো একটি অতিরিক্ত গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। যার ব্যাখ্যা এরূপ ঃ হযরত সাহাবায়ে কেরাম মহানবী (সাঃ) এর নিকট আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমরা জানতে পারতাম, কোনটি সর্বোত্তম মাল? যা আমরা অর্জন করতাম, তাহলে খুব ভাল হত। তখন মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ

সর্বোত্তম মাল যিকিরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তর এবং ঐ মুমিন স্ত্রী, যে তার স্বামীকে ঈমানের ব্যাপারে সাহায্য করে।

-মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী

যে জিনিষ দ্বারা কাজ সমাধা হয় এবং প্রয়োজন পূর্ণ হয়, সেটা মাল। মানুষ সাধারণতঃ স্বর্ণ, রূপা, টাকা, পয়সা, দেরহাম, দানানীর, বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, গরু-ছাগল, চতুষ্পদ জন্তুকে মাল মনে করে। অথচ হাদীস শরীফের দৃষ্টিতে মাল ঐ জিনিষ, যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এতে খুব বেশী উপকার হয় এবং বন্দার অনেক কাজে আসে। যিকিরকারী জিহ্বা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তর সবচে' বড় দৌলত। আর স্ত্রীও বড় মূল্যবান সম্পদ, যার মহৎগুণ এই تعين على ! يمانه

অর্থাৎ স্ত্রী এমন গুণের অধিকারিনী, যে স্বামীকে ধর্মীয় কাজ-কর্মে

সাহায্য করে। ঈমানের উপর স্বামীকে সাহায্য করার ব্যাখ্যা মুল্লা আলী কারী (রাঃ) স্বীয় গ্রন্থ মেরকাত শরহে মেশকাতে লিখেছেন ঃ

ঈমানের উপর সাহায্য করার উদ্দেশ্য এই যে, স্বামীকে দ্বীনদারীর ব্যাপারে সহযোগিতা করে এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাকে নামায, রোযার ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অন্যান্য ইবাদতে স্বামীকে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে তাকে যেনা ব্যভিচার এবং সর্ব প্রকার গুনাহ থেকে বিরত রাখে।

বস্তুত ঃ আমাদের নিত্য পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও ইসলাম বিরোধী সমাজ ব্যবস্থা সংশোধনে এমন গুণবতী নারীর একান্ত প্রয়োজন। যে নিজেও দ্বীনদার হবে এবং স্বীয় স্বামী ও সন্তান সন্ততিকে দ্বীনদার বানানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু এর বিপরিত এ সমাজ ব্যবস্থা তৈরী হয়ে রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনের উপর চলতে চায়। তো বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাকে দ্বীন থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। অন্যান্যদের সাথে ঘরের স্ত্রীও দ্বীনদারী এখতিয়ার করতে বাধা প্রদান করে এবং দ্বীনদারী থেকে বিরত রাখতে বিভিন্ন প্রকার বাহানা তালাশ করে। মুল্লা হওয়ার ঘৃণা দেয়, দাড়ি রাখতে নিষেধ করে। পাঞ্জাবী পাজামা পরিধান করলে "বাউল" বলে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা দেয়। ঘুষ না খেলে আকথা-কুকথা শুনিয়ে দেয়।

হে আল্লাহ! আমাদের সমাজে মুমিন স্ত্রীর খুব প্রয়োজন। নারী-পুরুষ সকলের মধ্যে ঈমানী উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দাও। বিশেষ করে যারা আদর্শ স্ত্রী হতে চায়, তাদের অন্তরে তোমার হুকুম মান্য করার এবং তোমার প্রিয় হাবীব (সাঃ) এর সুন্নতের উপর চলার তাওফীক দান কর। মুসলিম পরিবারের প্রতিটি নারীকে হযরত খাদীজা (রাঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ) হযরত উম্মে সালামা সহ নবী পত্নীদের এবং হযরত ফাতিমা সহ অন্যান্য নবী নন্দীনীদের আদর্শে আদর্শবান হয়ে আদর্শ স্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সে শক্তি ও হিম্মত দাও। যারা নিজেও গুনাহ থেকে বাঁচবে, প্রাণপ্রিয় স্বামীকেও গুনাহ থেকে বাঁচাবে। নিজে সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও যাদের স্বামীরা বেগানা নারী বা পরস্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়, তাদের মত পোড়া কপাল, হতভাগা ও ছন্নছাড়া স্ত্রী তৃ-ভূবনে নেই। স্বামীকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর একটি সহজ পদ্ধতি পাঠক/পাঠিকাদের সমীপে উপস্থাপন করছি। ভাল লাগলে অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

স্বামীকে গুনাহ থেকে বাঁচানো

আপন স্বামীকে সর্বপ্রকার পাপকাজ, অসৎকাজ তথা সমাজবিরোধী, ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ হতে বাঁচিয়ে রাখা প্রতিটি আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। নিজ স্বামীকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা একটি সীমাহীন গুরুত্বপূর্ন বিষয়। অথচ এ বিষয়টির প্রতি সাধারণতঃ আমাদের মুসলমান বোনেরা তেমন একটা ভ্রুক্ষেপ করেনা-যেমনটা হওয়া আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। নিজ প্রাণপ্রিয় স্বামীকে স্বীয় অবয়ব, রূপ-লাবণ্য, সৌন্দর্য, সাজ-গোজ ও পোশাক-পরিচ্ছদ দ্বারা নিজের প্রতি সদা আকৃষ্ট করে আপন বানিয়ে ধরে রাখার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা আজ শূন্যের কোঠায় অথবা তার কাছাকাছি। অথচ এর ক্ষয়-ক্ষতির বোঝার পরিমাণ কম হেক, বেশী হেক স্ত্রীদেরই বহন করতে হয়।

আদর্শ স্ত্রীরা বা গৃহবধূর তো সেই মুসলিম নারী, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বামীদের পোশাক এবং স্বামীদেরকে তাদের পোশাক সাব্যস্ত করেছেন। এর মূল হেতু কি? পোশাক-পরিচ্ছদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহা উদ্দেশ্য তো লজ্জাস্থান আবৃত করা। অন্য আরো একটি উদ্দেশ্য হল, সৌন্দর্য বর্ধন। যেমনিভাবে পোশাক মানুষের দেহাবয়বকে আবৃত করে নেয়, তেমনিভাবে স্ত্রীগণও সাজ-সজ্জা, রূপ পরিচর্যা ও সৌন্দর্যের মাধ্যমে স্বীয় স্বামীদের জন্য নিজদেরকে সজ্জিত করে তাদের দৃষ্টি ও মনকে নিজেদের পানে আকৃষ্ট করে তাদের পরিচ্ছদ হয়ে তাদেরকে প্রেম-ভালবাসার বাহু ডোরে বেঁধে তাদের বৈধ মনোবাঞ্ছা, কামনা-বাসনা পূর্ণ করার কেন্দ্রমূল বানিয়ে নেয়। আর যেমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের ভিতর মানুষ খোলা-মেলা দেখায় না এবং তারা লোকচক্ষুর সম্মুখে থাকে আবৃত, তেমনিভাবে পৃথিবীবাসীদের সম্মুখে স্বামীর ইজ্জত-আব্রু ও সম্ভ্রম সংরক্ষিত থাকে, যদিও স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সর্বপ্রকার গেপনীয়তা সম্পর্কে অবগত আছে। কোন কিছুই স্ত্রীর নিকট গোপন থাকে না।

স্ত্রী যদি স্বামীর উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং গৃহাভ্যন্তরে স্বামীর সম্মুখে মেথরাণী, ঝাড়ুদারনী আর কাজের বুয়ার মত এমন বেঢঙ্গা, অপরিচ্ছন্ন পোশাকে আগোছোলো চুলে ঘুরাঘুরি করে যে, স্বামীর দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয় না, স্বামীর মন তার দিকে ঝোঁকে না, বরং তার দৃষ্টি

প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি অথবা পথে-ঘাটে, অফিস-আদালতে অন্যের স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, আর পথভ্রান্ত হয়ে পাপে লিপ্ত হয়, তাহলে এর দুঃখজনক দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর উপরও অবশ্যই বর্তাবে। তাই ঘরের স্ত্রীর জন্য এমন রূপচর্চা করে সেজে-গুজে, পরিপাটি হয়ে নিজেকে স্বামীর সম্মুখে উপস্থাপন করা আবশ্যক, যেন স্বামীর দৃষ্টি একমাত্র তার উপরই নিবদ্ধ থাকে। তখন বিউটি পার্লারে ডিউটি দিয়ে রূপচর্চাকারীনীদের কৃত্রিম রূপের ঝলকেও স্বামীর মন ও দৃষ্টি তাদের প্রতি ঝুঁকবে না। তাই মুসলমান ভগ্নীদের প্রতি আকুল আবেদন-তোমরা স্বামীর নিমিত্ত স্বীয় সত্তা, ব্যক্তিত্ব, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা এমন আকর্ষণীয় পন্থায় করবে, যেন প্রাণপ্রিয় স্বামীর হৃদয়রাজ্যে তুমি একাই রাজত্ব করতে পার। ইসলামের বৈধ সাজ-সজ্জা, রূপচর্চা করতে নিষেধ নেই। বৈধ সাজ-সজ্জা না করে স্বামীর অন্তরে ঘৃণার বীজ বপন করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক ছাড়া আর কি?

স্বামীর মন জয় করতে পারাই স্ত্রীর স্বার্থকতা। লক্ষণীয় ও স্মরণীয় বিষয় এই যে, তোমার সামান্য ভ্রুক্ষেপ, সামান্য সাজ-সজ্জা, রূপচর্চা স্বামীকে বড় বড় গুনাহ হতে বাঁচাতে পারে। স্বামীকে তুমি নিজের দিকে ধাবিত করে তাঁর বড় বড় পেরেশানী দূরিভূত করে দিতে পার।

অসংখ্য মহিলাদের অভিযোগ এই যে, "আমার স্বামী আমাকে ভালবাসে না।" "আমার খোঁজ-খবর নেয়না।" "আমার কোন কথার মূল্যায়ন করে না" "শাশুড়ী ও ননদদের পরামর্শ অনুযায়ী চলে" "তাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে" আমার সন্তানদেরও আদর করে না" "অফিস বা দোকান থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেই সামান্য ব্যাপারে ধমকাতে থাকে, শাসাতে থাকে .... ইত্যাদি।"

মনে রাখবে, এ সকল অভিযোগের চিকিৎসা ও তদবীর হল, তোমার গৃহে প্রসাধনী সামগ্রী যৎসামান্য যা কিছু রয়েছে, তা দ্বারা নিজেকে সাদামোটা করে হলেও সজ্জিত করে রাখবে। আল্লাহ তা'আলা আপন মেহেরবানী দ্বারা তোমাকে যতটুকু সৌন্দর্য ও রূপ দান করেছেন, তার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় করতঃ বৈধ সাজ-সজ্জার মাধ্যমে স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা চালাবে। তখন স্বামীর দৃষ্টিতে দেখতে তুমি সুন্দরীদের মতই লাগবে। এটা কিন্তু পরীক্ষিত প্রেস্‌কিপশন। আর তুমি যখন প্রাণপ্রিয়

স্বামীর দৃষ্টিতে প্রিয়তমারূপে, তাঁর হৃদয় গভীরে হৃদয়রাজ্যের রাণীরূপে আসন গ্রহণ করতে পারবে, তখন তোমার সমস্ত অভিযোগ, সমস্ত দুশ্চিন্তা নিজে নিজেই দূর হয়ে যাবে। তখন তোমার স্বামী তোমার আবেদন-নিবেদন এমনকি আদেশও মানবে, বড় বড় দোষ-ক্রটিও ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে থাকবে। তোমার বিরুদ্ধে কারো কথায় কানও দিবে না। কারণ, তুমি এখন তার প্রিয়তমা। পৃথবীর আনত নয়না সুন্দরী থেকে সুন্দরী রমণীগণ তোমার স্বামীর দৃষ্টি ও মনকে প্রতারণার ধুম্রজালে ফাঁসাতে পারবে না। তাই স্বামীর জন্য সাজ-সজ্জার পন্থা অবলম্বন করবে। অন্যথায় বিরহ ব্যাথার করুণ সুর বাজতে থাকবে অহর্নিশি তোমার অন্তরের গভীরে। তখন কিছুই থাকবে না ক্রন্দন ও আহাজারী করা ব্যতীত। রূপচর্চার মাধ্যমে জীবনসঙ্গীকে সন্তুষ্ট রাখতে সদা চেষ্টা করবে। সর্বদা চিন্তামুক্ত হয়ে সুখে থাকতে পারবে।

মুসলীম ভগ্নীগণ! স্মরণ রাখবে, যদি অফিসে অথবা স্কুলে কিংবা কোম্পানী বা মিল-কারখানায় কোন সহকর্মী সুন্দরী রমণী মুহাব্বত ভরা মিষ্টি কন্ঠে তোমার অসন্তুষ্ট স্বামীকে শুধু এতটুকু বলে যে, স্যার! আজ আপনাকে বেশ চিন্তিত-বিষন্ন লাগছে। বাড়ীতে কোন অসুবিদা হয়েছে, স্যার?

সুন্দরী রমণীর মধুমাখা কন্ঠের এ ছোট্ট প্রশ্নটুকু বিবাহিত পুরুষের পাথরসম পাষাণ হৃদয়কে মোমের মত বিগলিত করতে এবং তাকে আকৃষ্ট ও ভ্রান্ত করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে; বরং তা তোমার ভারাক্রান্ত, ব্যথিত স্বামীকে পাপকর্মে প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ করতে আহ্বায়ক ও সহায়ক হবে। এমনিভাবে বাস ষ্টপে অপেক্ষমান মেকআপ মাখা কোন বারবণিতার প্রেমে পড়ে তোমার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে। যখন মেকআপ মাখা মুখের কৃত্রিম সৌন্দর্যে মাতওয়ারা হয়ে তোমার স্বামী বে-গানা নারীর আতিথেয়তা গ্রহণ করে প্রতারিত হবে, তখন তোমার সুন্দর সাজানো গৃহ রূপান্তরিত হবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে। পক্ষান্তরে যদি তুমি নিজেকে ঘরের মাসী বা চাকরাণির মত অপরিষ্কার বদনে ও পোশাকে অপরিচ্ছন্ন না রাখ, বরং সাজ-সজ্জা ও মিষ্টি মধুর আচরণের মাধ্যমে স্বামীর হৃদয়কে জয় করে নিতে পার, তাহলে নিশ্চিতরূপে একথা বলা যেতে পারে যে, স্বামী কষ্মিনকালেও কোন প্রকার পেরেশানী বা পাপকর্মে লিপ্ত হবে না।

আমরা দৃঢ়তার সাথে ও সহস্র পুরুষের অভিজ্ঞতার আলোকে আদর্শ স্ত্রী ও গৃহবধূদের উপদেশ প্রদান করা সমাচীন জ্ঞান করছি যে, স্ত্রী নিজ স্বামীর গৃহে পরিচ্ছন্ন না থাকা, নিজ অবয়বকে স্বামীর জন্য সজ্জিত না করা, স্বামীর দৃষ্টিতে নিজেকে অপরূপ সুন্দরীরূপে উপস্থাপন না করা, মিষ্টি-মধূর আচরণ, অমায়িক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রিয়তমকে আকৃষ্ট না করা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে অসংখ্য দুশ্চিন্তার মধ্যে পতিত হতে বাধ্য করে। সুতরাং তুমি এটা প্রাণপন চেষ্টা করবে যে, তোমার স্বামী যখনই তোমার মুখ পানে দৃষ্টিপাত করবে, তখন যেন তোমার সাজ-সজ্জায় বিমোহিত হয়ে তার দৃষ্টি দ্বারা মুহাব্বতের বৃষ্টিপাত হয়। বিশেষ করে প্রতিবারেই যেন তুমি নতুন বউ অনুমেয় হও, সেরূপ রূপচর্চা করে পরিপাটি হয়ে গৃহিণীর দায়িত্ব পালন করবে। ইনশাআল্লাহ! তোমার অসংখ্য, অগণিত পেরেশানি ও অভিযোগ দূর হয়ে যাবে। আর তোমার স্বামী হয়ে যাবে তোমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "নেক স্ত্রীর নিদর্শন হচ্ছে- যখন স্বামী তার দিকে তাকায়, তখন সে ভালবাসার দ্বারা স্বামীকে সন্তুষ্ট করে।"

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

স্বামীর মনের তালা খুলতে পারা

বদ্ধতালা খোলা যায় চাবী দ্বারা। কিন্তু মনের তালা কি খোলা যায় চাবী দ্বারা? না খোলা যায় না। মনের তালা খুলতে পারে মনের মানুষ। স্বামীর মনের মানুষ একমাত্র তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী-ই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে-ই তার প্রাণপ্রিয় স্বামীর মনের তালা খুলতে পারে। তবে প্রশ্ন হল, স্বামীর মনের বদ্ধ তালা স্ত্রী কিরূপে খুলতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর ও দিক নির্দেশনা নিম্নে প্রদত্ত্ব হল। আশাকরি আদর্শ স্ত্রী এবং প্রতিটি বিবাহিতা, অবিবাহিতা নারীর উপকার হবে।

এ কথা বাস্তব সত্য যে, স্বামী যতই স্ত্রীবিমুখ হোক না কেন; যতই পাষাণহৃদয়ী হোক না কেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রাকৃতিকভাবে নারী জাতিকে এমন কামনীয় ঢং, আকর্ষণীয় রং, সুমিষ্ট ভাষা, হৃদয়গ্রাহী হাসা, রূপেমাখা কপাল, হাসিমাখা কপোল, শরমমাখা স্বভাব, নরমমাখা প্রভাব, পাগল করা ঠোঁট, পটল চেরা চোখ, মুক্তাঝড়ানো দাঁত, নরম পেলব হাত,

রংবেরঙ্গের বেশ, নয়ন জুড়ানো কেশ দান করেছেন। নেক, সৎ, খোদাভীরু ও বুদ্ধিমতি আদর্শ স্ত্রীরা আল্লাহ প্রদত্ত্ব ঐ নেয়ামতসমূহকে যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাণপ্রিয় স্বামীকে একান্ত আপন বানিয়ে নেয়।

যদি কোন স্ত্রী বলে যে, আমাকে এমন একটি তাবীয দিন, যেন আমার স্বামী আমাকে মুহাব্বতের দৃষ্টিতে দেখতে থাকে, আমাকে ভালবাসে, আদর-সোহাগ করে। তখন আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে হয় যে, তার (স্ত্রীর) প্রতিটি ভাষা, প্রতিটি হাসা, প্রতিটি চাহনী, প্রতিটি আবরনী, প্রতিটি রং, ঢং, কপাল, কপোল, স্বভাব, প্রভাব সবকিছুই যখন তাবীয এবং প্রত্যেকটিতে রয়েছে যাদুর চেয়ে অধিক প্রভাব ও ক্ষমতা, তখন সে কেন এবং কিসের তাবীয চাচ্ছে?

হ্যাঁ, স্বামী যদি বলে যে, আমাকে একটি এমন তাবীয দিন, যদ্দারা আমার স্ত্রী আমাকে মান্য করে, ভালবাসে, তাহলে এটা বিবেকে ধরার মত কথা হতে পারে এবং এ ব্যাপারে চিন্তা করা যেতে পারে, তাকে কোন দিকনির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কামনীয় আচরণ, বিশেষ করে ত্যাগ-তিতিক্ষা, ধৈর্য্য-সহ্য, সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং আত্মবিসর্জনের মত মহৎ গুণে এমন যুগান্তকারী প্রভাব রয়েছে, যার সমতুল্য অন্য কোন বস্তু নেই।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যদি ১৩০ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিং এর উপর কোন নারী দাড়িয়ে থাকে, আর কোন পুরুষ পথিক আনমনে পথ চলতে থাকে, তাহলে সহজাত স্বভাবের বশবর্তী হয়ে পুরুষ ঐ নারীকে দেখার জন্য একবার হলেও মাথা তুলে উর্ধমুখী তাকাতে বাধ্য হবে।

আকর্ষণের দিক দিয়ে লু'লু', মারজান ও ঝামরাদের কোন পাথর, মাকনাতীসের কোন অমূল্য খন্ড এতটুকু প্রভাব ফেলতে পারে না, যতটুকু একজন নারী একজন পুরুষের উপর স্বীয় প্রভাব খাটাতে পারে।

মনোবিজ্ঞানীরা অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথাও বলেছেন যে, "যদি কোন ধুধু প্রান্তরে নারীর একটি কঙ্কাল এবং পুরুষের একটি কঙ্কাল পাশাপাশি রেখে দেয়া হয়, তবুও তাদের মাঝে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যাবে।"

পুষ্পকাননে সাড়ি বাঁধা পুষ্পবৃক্ষের সৌন্দর্য একদিকে, শীতল সমিরণে দোল খাওয়া একগুচ্ছ লাল গোলাপের অপরূপ রূপ একদিকে, শানবাঁধা

পুকুর ঘাটে ভাসমান নীল পদ্মের মনোরম দৃশ্য একদিকে, হাসনেহেনার মন মাতানো মিষ্টি সুবাস একদিকে, শিশির ভেজা দুব্বা ঘাসে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়ে থাকা শিউলি ফুলের আত্মসমর্পন একদিকে, আউসের ক্ষেতে বয়ে যাওয়া ঝিরি ঝিরি বাতাসের ছন্দময় গতির সৌন্দর্য একদিকে, আষাঢ়ের বৃষ্টিস্নাত গোধূলী বেলায় নীল আকাশে মেঘমালার লুকোচুরি খেলার দৃশ্য একদিকে, দোয়েল-কোয়েল ও কোকিলের কিচির মিচির, কুহু কুহু শব্দ ব্যঞ্জন একদিকে, অভিমানী, লজ্জাবতী বৃক্ষের পাতার আনুগত্য একদিকে আর নেক, সৎ ও ফরমাবরদার স্ত্রীর আনুগত্যমাখা ও মুচকী হাসি একদিকে। যেমন ঃ স্ত্রী স্বামীকে বলবে জানে মান! বলুন, কি হুকুম? আমি সেবার জন্য সদা প্রস্তুত। কি লাগবে? কি দরকার, কি খাবেন? ..... ইত্যাদি।

এ হল একজন নেক, ফরমাবরদার, অনুগত ও বাধ্যগত আদর্শ স্ত্রীর চিত্র, উপমা। তাই, জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিমতী স্ত্রীকে স্বামীর ভালবাসা, আদর-সোহাগ পাওয়ার নিমিত্ত অথবা পিয়ার-মুহাব্বত বৃদ্ধি করার নিমিত্ত ঝাড়-ফুঁক বা তাবীয-তুমারের মোটেও প্রয়োজন নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোন স্ত্রীর নসীবে যদি বদমেজাজ, স্ত্রীবিমুখ স্বামী জোটে, যাকে শুক্ষ্ম বুদ্ধি, হেকমত ও গভীর প্রজ্ঞা দ্বারা কুপোকাত করে নির্ঘাত বাজীমাত করার প্রয়োজন দেখা দেয় অথবা বিবেক-বিবেচনা ও ছলচাতুড়ীর পায়েল দ্বারা স্বামীকে ঘায়েল ও মায়েল করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাহলে এমন স্বামীর আবদ্ধ তালাকে খোলার পাঁচ পাঁচটি যাদুমাখা চাবি উপস্থাপন করা সমীচীন করছিঃ

(১) প্রথম চাবি দৃষ্টি ঃ সর্বপ্রথম পুরুষের অন্তর ও মেজাজে যে বস্তুটি আঘাত করে, তাহল পুরুষের দৃষ্টি। প্রথমে তার দৃষ্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই মেয়েটি তার জীবন চলার পথে সঙ্গীনীরূপে ফিট হবে কিনা? সংসার নামের দুর্গম পথ পাড়ি দিতে পারবে কি-না? অতঃপর তার অন্তর সত্যায়ন করে, হ্যাঁ অথবা না .....?

তাই প্রতিটি বুদ্ধিমতী স্ত্রীর করণীয় এই যে, নিজেকে সদা-সর্বদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সহ শোবার ঘর এবং সন্তানদেরকে যত্ন সহকারে পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখবে। যাতে করে স্বামীর দৃষ্টি স্ত্রীর ময়লামাখা গাল বা পোশাকের উপর পতিত না হয়। অতঃপর স্বামীর অন্তর ব্যথিত না হয়। বরং সেজে-গুজে এমনভাবে আকর্ষণীয় হয়ে থাকবে, যাতে করে স্বামীর দৃষ্টি তা দেখে পরিতৃপ্ত হয়।

(২) দ্বিতীয় চাবি কর্ণ ঃ কর্ণ দ্বারা স্বামীর কথা শ্রবণ করা, অতঃপর তা মান্য করা। এমনিভাবে স্বামীর কর্ণকুহুরে এমন মিষ্টি সুরে কথা পৌঁছে দেয়া, যাতে সে পাগল দেওয়ানা হতে বাধ্য হয়। কতক গৃহিনীর আক্ষেপ ভরা কথা শ্রবণ করে আশ্চর্যান্বিত হই, যখন তারা স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে যে, স্বামী তাকে খুব প্রহার করে, কথায় কথায় ধমকায়, শাসন করে, তার কথা মোটেও শুনতে চায় না, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায়না ..... ইত্যাদি। অথচ মহামহিমাময় আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন মধুমাখা সুরেলী কণ্ঠ দান করেছেন যে, যদি ঐ কণ্ঠের সঠিক ব্যবহার, সঠিক প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে ফাগুন আনা বসন্ত কালের কোকিলের কুহু কুহু কণ্ঠ, অন্তরে আগুনআনা মাছরাঙ্গা পাখির রূপের ঝলক, পাখ-পাখিলীর কিচির-মিচির শব্দের তরঙ্গ, ময়না পাখির পাগল করা অঙ্গ, মৌমাছিদের গুনগুনাগুন গান গাওয়া, পৌষ মাসে ধানের ক্ষেতের হিমেল হাওয়া, প্রজাপতির পাখনাতে যে রঙ্গের বাহার, হাসনে হেনা ফুলের যে মিষ্টি সুবাস, কিশোরীর খোপায় সুশোভিত বকুল ফুল, আম বাগানের থোকা থোকা আম্র মুকুল, প্রভাতকালে ফুল বাগানের লাল টুকটুক জবা, সাঁজের বেলা পশ্চিম দিগন্তের রক্তমাখা আভা, আর শরৎকালে শিশির ভেজা শিউলি ফুলের হাসি-এসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একদিকে, কিন্তু কোমল হৃদয় ও ফরমাবরদার স্ত্রীর বিনম্র বোল ও কথা হাউজে কাউছার এবং তাছনীম নামক নির্ঝরনীর পানি দ্বারা বিধৌত ফুলের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। যেমন ঃ স্বামীর কথা কানে পৌঁছার সাথে সাথে উপস্থিত হয়ে স্ত্রী যদি চাঁদমাখা চেহারা নিয়ে মিষ্টি হেসে বলে, আমি এসেছি, কোন কিছু লাগবে কি?

পাঠক/পাঠিকা ইনসাফ করে বলুন, এমন চৌকান্না স্ত্রীর প্রতি কি স্বামী অসন্তুষ্ট থাকতে পারে?

তাই বুদ্ধিমতি আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য এই যে, খুব বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সাথে লক্ষ্য রাখবে যে, স্বামীকে কোন সময় কি বলতে হবে? কখন নিরব-নিথর থাকতে হবে? কখন নম্রতার সাথে কথা বলতে হবে? কেমন আবদার বা মান-অভিমান তিনি পছন্দ করেন? মেজাজটা তাঁর আজ ঠান্ডা, না গরম? .... ইত্যাদি, ইত্যাদি। এসব স্থান-কাল পাত্রের প্রতি খু-উ-ব লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, এসব ঐ পথ, যা স্ত্রীকে স্বামীর হৃদয় গভীর পর্যন্ত পৌঁছাতে চমৎকার সহায়তা করে। বিশেষ করে কর্ণ এমন একটি পথ, যার

ছিদ্র দ্বারা যদি একবার কোন কথা বা শব্দ প্রবেশ করে, তাহলে তা মউত্তক কর্ণকুহুরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলিম স্বামী-স্ত্রীকে ভাল কথা বলার এবং ভাল কথা শ্রবণ করার শক্তি দান করুন।

(৩) তৃতীয় চাবি নাসিকা ঃ নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ লওয়া এবং স্বামীর নাসিকাকে সন্তুষ্ট রাখা। প্রতিটি আদর্শ স্ত্রীর করণীয়, বরণীয় কর্ম এই যে, প্রতিদিন প্রাণপ্রিয় স্বামীর জন্য এমন সুগন্ধি আতর ব্যবহার করবে, যা তাঁর মন-মস্তিষ্ক ও অন্তরকে বিমোহিত করে দেয়। সুগন্ধি এমন হবে, যার রং হবে গাঢ় কিন্তু গন্ধ হবে প্রচুর। যেমন ঃ গন্ধযুক্ত মেহেন্দী, জাআফরান ইত্যাদি। কোন সময় কেমন সুগন্ধি ব্যবহার করতে হবে, সে ব্যাপারে মেয়েরাই বেশী অভিজ্ঞতা রাখে। এমনিভাবে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে খুশবু লাগিয়ে দেয়ার সুন্নতটিও আদায় হয়ে যাবে। হযরত আয়িশা (রাঃ) মহানবী (সাঃ) এর এহরামের কাপড়ে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতেন, এই আতর মাখা-মাখি স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের সম্পর্ককে আরো আরো সুদৃঢ়, মজবুত, শক্তিশালী বানানোর এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

(৪) চতুর্থ চাবি হস্ত ঃ আমাদের দেশের অধিকাংশ বিবাহিতা নারীর এ বাস্তব সত্যটি জানা থাকেনা যে, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর স্পর্শিত হওয়া উভয়ের অন্তর এক হওয়ার বড় সহায়ক। কুদরতী ও প্রাকৃতিকভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শরীরের স্পর্শজনিত উষ্ণতা বিশেষ করে স্ত্রীর কর্তৃক স্পর্শ দ্বারা যে উষ্ণতা নির্গত হয়, তা উভয়ের অসংখ্য রোগ-ব্যধি ও দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ধ্বংস করার পরীক্ষিত কারণ।

সুতরাং, মুসলমান আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য এই যে, হযরত আদম (আঃ) হতে আজ পর্যন্ত যে নিয়মটি প্রচলিত হয়েছে, তার বিরোধিতা না করা; বরং জাগতিক, পরকালিক ঐ উপকার অর্জন করতে স্বামীকে জান-প্রাণ দিয়ে সহায়তা করা। দাম্পত্য জীবনে সুখময়, আনন্দময় ও দীর্ঘস্থায়ী করতে প্রতিদিন স্বামীকে হস্ত দ্বারা কোমল স্পর্শ উপহার দিবে। প্রতিদিন নিদ্রা যাওয়ার প্রাক্কালে মসজিদ, মাদ্রাসা, অফিস, আদালত, মিল-কারখানা তথা কর্মস্থল থেকে ফিরে আসা স্বামীর ক্লান্ত দেহে কোমল হাতের স্পর্শ দ্বারা প্রশান্তি বর্ষণ করবে। অতঃপর মস্তক শীতলকারী যে কোন ভাল তৈল

দ্বারা স্বীয় হস্তে মাথা মালিশ করবে। সম্ভব হলে, হাত, পা মর্দন করবে। বুদ্ধিমতি আদর্শ স্ত্রী তারাই, যারা আপন স্পর্শ দ্বারা উভয়ের দু'টি মন দু'টি দেহকে এক মন এক দেহ বানাতে সফলকাম হয়।

(৫) পঞ্চম চাবি মুখ ঃ কোন বস্তুর স্বাধ গ্রহণ বা সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য আস্বাদন করতে মুখের ভূমিকাটাই মুখ্য। মুখের ক্ষমতা, প্রভাব ও কার্যকারিতা অপরিসীম। মুখ মানব দেহের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-ভালবাসা ও সুগভীর সম্পর্ককে আরো গভীরতর করতে মুখের বড় প্রভাব। স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্কের গভীরতা কোন থার্মোমিটার বা কোন আধুনিক প্রযুক্তি অথবা রাডার কিংবা কোন ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা যায় না; যতটুকু পারা যায় মুখ দ্বারা। আর তা হল, স্বামীর সোহাগমাখা চুম্বন গ্রহণ করা এবং স্বামীকে শ্রদ্ধাচুম্বন উপহার দেয়া। বুদ্ধিহীন, নির্বোধ ও অশিক্ষিত নারীরাই কেবল এ যুগান্তকারী ছাওয়াবের কাজটিকে অবজ্ঞা, অবহেলা করতে পারে।

মহিলা ছাহাবীয়া (রাঃ) হতে বিভিন্ন সময়ে স্বীয় স্বামীকে শ্রদ্ধাচুম্বন করার ঘটনা প্রমাণিত রয়েছে। বিশেষ করে স্বামী যখন গৃহ থেকে কর্মক্ষেত্রে গমন করছেন, তখন স্ত্রী স্বীয় স্বামীর ললাটে বিদায় সম্বোধনসরূপ চুম্বন করতে পারে। এতে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধির সুবাদে পিয়ার-মহাব্বত ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। স্বামী বিদেশে অথবা দেশের অভ্যন্তরে সফরে যাচ্ছেন তখনো স্বামীর ইজ্জত-সম্মান ও শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে তার ললাটে চুম্বন করা যেতে পারে। তবে শালীনতা ও গোপনীয়তা এতে আবশ্যকীয় শর্ত।

আমাদের মুসলিম সমাজের অনেক নারী এ কার্যকরী ফলপ্রসূ কাজটিকে শালীনতা বিবর্জিত ও নির্লজ্জতা আখ্যা দিয়ে গা বাঁচিয়ে রাখে। এতে স্বামীর মনের বন্ধ তালা বন্ধই থেকে যায়। অতঃপর সামান্য ভুলের কারণে তাদের সংসার ও দাম্পত্য জীবন রূপান্তরিত হয় রসকষহীন শোলার মত অথবা আদা-লবনহীন ডালের মত।

অনেক গৃহিণীকে দেখা যায়, স্বামীর মুহাব্বত বৃদ্ধি করার নিমিত্ত পানি পড়া নিতে অথবা আমল শিক্ষা করতে কিংবা তাবীয-তুমারী, ঝাড়-ফুক, যাদু টোনার আশ্রয় নিতে। যাতে করে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ না করে; বরং

স্বামীর পূর্ণ মনোযোগ, মনের সকল ঝোঁক সকাল-বিকাল-সন্ধ্যা তথা অহর্নিশি তার-ই প্রতি ধাবিত থাকে, অন্য কারো প্রতি নয়। আমি মনে করি, এ অকার্যকরী পদক্ষেপ না নিয়ে উল্লেখিত তাবীয ব্যবহার করুন। দেখবেন, তালা খোলে কিভাবে।

অধিকাংশ মেয়ে, যারা পিত্রালয়ে পড়ে থাকে অথবা স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হয় কিংবা তার স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য হয়, তার কারণসমূহ যাচাই করলে এ কথাই প্রতিয়মান হয় যে, স্ত্রীদের পক্ষ থেকে উল্লেখিত পাঁচটি চাবি ব্যবহারের অলসতা। অবহেলা ও অলসতার কারণেই সে তার স্বামীর মনের তালা খুলে তার অন্তর জয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর যে নারী স্বীয় স্বামীর অন্তর জয় করতে ব্যর্থ হল, তার জানা-ই নেই, ভালবাসা কারে কয়।

তাই প্রতিটি আদর্শ স্ত্রী, গৃহবধূর কর্তব্য এই যে, উল্লেখিত উপদেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে স্বামীর অন্তর জয় করা। যাতে করে এ সুন্দর বসুন্ধরার ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীও যেন স্বর্গসুখে ভরে যায়।

আদর্শ স্ত্রীর জন্য দশটি ওসীয়ত ঃ

আমরা আরবের জনৈকা প্রসিদ্ধ, বিজ্ঞ মহিলার দশটি ওসীয়ত উপস্থাপন করছি, যিনি তার সদ্য বিবাহিতা কন্যাকে শ্বশুরালয়ের পথে বিদায়ের প্রাক্কালে হিদায়াতমূলক কথাগুলো বলেছিলেন। আশা করি, মুসলিম নারীগণ যদি সে সকল ওসীয়তের উপর আমল করে, তাহলে সংসার ও পরিবার জান্নাতের সুখের নমুনা হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রথম ওসীয়ত ঃ
(অল্পে তুষ্ট থাকা)

তিনি কন্যাকে বলেন, হে আমার প্রিয় কন্যা! জীবনসঙ্গী স্বামীর গৃহে যেয়ে স্বল্পে তুষ্ট থাকার অভ্যাস করবে। কৃচ্ছতার সাথে জীবন যাপন করায় অভ্যস্থ হবে। ডাল-ভাত যা মিলে, তার উপর তুষ্ট থাকবে। স্বামী সন্তুষ্ট হয়ে যদি শুকনো রুটিও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, তবে মুরগী-পোলাও হতেও উত্তম মনে করবে। সুস্বাদু খাদ্য-দ্রব্য ও মুল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য স্বামীকে চাপ দিবে না।

দ্বিতীয় ওসীয়ত ঃ
(মান্যতা ও আনুগত্যের সহিত জীবন যাপন)

তিনি বলেন ঃ হে কলিজার টুকরা আমার! স্বামীর প্রতিটি কথা সর্বদা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে এবং তার আদেশের প্রতি গুরুত্ব দিবে। স্বামীর হুকুমের উপর যে কোন মূল্যে আমল করতে চেষ্টা করবে। এভাবে তুমি তার মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিতে পারবে। কেননা, মানুষের দেহের কোন মূল্য নেই। মূল্য তার সুন্দর ব্যবহারের।

তৃতীয় ওসীয়ত ঃ
(সাজসজ্জা ও রূপের দ্বারা স্বামীকে আনন্দ দান)

তিনি বলেন ঃ যে আমার আদরের মেয়ে! স্বীয় রূপ-চর্চার প্রতি এমন লক্ষ্য রাখবে যে, তোমার স্বামী যখন তোমাকে দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন, তখন তার দৃষ্টি দিয়ে যেন মহাব্বতের বৃষ্টি বর্ষিত হয়। তোমায় দেখলে যেন আনন্দে মন ভরে যায়। তাই সাদা-মাটা প্রসাধনী সামগ্রী যা ভাগ্যে জোটে, বিশেষ করে স্বামীর একান্তে যেতে সুগন্ধি-আতর, স্নো অবশ্যই ব্যবহার করবে। আর স্মরণ রাখবে, তোমার দেহ বা পোশাকের কোন দুর্গন্ধ অথবা মন্দ পরিস্থিতি যেন স্বামীর নিকট ঘৃণিত বা অপছন্দনীয় অনুমিত না হয়।

চতুর্থ ওসীয়ত ঃ
(পাক-পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন)

তিনি বলেন ঃ হে আমার স্নেহের কন্যা! স্বামীর দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় লাগার জন্য সদা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। সুরমা ও কাজল দ্বারা আপন নয়ন যুগলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে। কেননা, সুরমা মাখা আকর্ষণীয় চোখের মনোহরণী চাহনী দর্শকের দৃষ্টিকে সহজেই কুপোকাত করতে পারে। আর নিয়মিত গোসল ও উযুর সাথে থাকবে। কেননা, পানি সর্বোত্তম খুশবু এবং পরিচ্ছন্নতা অর্জনের বেহ্‌তেরীন মাধ্যম।

পঞ্চম ওসীয়ত
(সময় মত খানা-বিশ্রামের ব্যবস্থা করা)

তিনি বলেন ঃ প্রিয় কন্যা আমার! স্বামীর পানাহারের ব্যবস্থা সময়ের পূর্বেই গুরুত্বের সাথে প্রস্তুত করে রাখতে ভুলবে না। কারণ, ক্ষুধার প্রচন্ডতা উৎক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত। তাছাড়া, ক্ষুধা মন্দা হয়ে গেলে মুরগী-পোলাও

অরুচিকর মনে হয়। স্বামীর বিশ্রাম ও নিদ্রার প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখবে। কেননা, নিদ্রা অসম্পূর্ণ রয়ে গেলে, মেজাজ রুক্ষ ও খসখসে হয়ে যায়। আচার-আচরণ হয়ে যায় মায়া-মমতা বর্জিত।

ষষ্ঠ ওসীয়ত
(স্বামীর মাল-ধন ও আসবাবপত্রের হিফাজত করা)

তিনি ওসীয়ত করেন, হে নয়নের মণি কন্যা আমার! স্বামীর ঘর ও তাঁর ধন-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবে, অর্থাৎ তাঁর অনুমতি ব্যতীত অন্য (অপরিচিত) কেউ যেন গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। তার ধন-সম্পত্তি প্রদর্শনীর মাধ্যমে অপচয়, অপব্যয় করে বিনষ্ট করবে না। কেননা, মাল-দৌলত ও ধন-সম্পত্তির সর্বোত্তম সংরক্ষণ ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সম্ভব। আর সন্তান-সন্ততির সুন্দরতম হিফাজত উত্তম প্রশিক্ষণ ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্ভব।

সপ্তম ওসীয়ত
(স্বামীর ঘরের গোপন কথা প্রকাশ না করা)

তিনি বলেন ঃ আদরের দুলালী আমার! স্বামীর গোপন তথ্য কখনো অপরের নিকট প্রকাশ করবে না। কেননা, তাঁর গোপন তথ্য বা ভেদের খবর যদি অপরের থেকে গোপন রাখতে সক্ষম না হও, তাহলে তোমার প্রতি তাঁর আস্থা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং বিশ্বাস উঠে যাবে। আর যদি তাঁর অবাধ্যতা ও নাফরমানী কর, তাহলে তুমি তাঁর অন্তরের দ্বি-মুখীপনা হতে নিরাপদে থাকেত পারবে না।

অষ্টম ওসীয়ত
(সুখে-দুঃখে স্বামীর সহযোগিণী হয়ে থাকা)

তিনি বলেন ঃ স্নেহাস্পদ আমার! স্বামীর মন যদি কোন কারণ বশতঃ দুঃখিত, ব্যথিত, মনোক্ষুন্ন ও কষ্টে ক্লিষ্ট হয়, তাহলে তাঁর সম্মুখে নিজের কোন আনন্দ প্রকাশ করবে না। বরং তার দুঃখে দুঃখিত হবে এবং তার পেরেশানীতে শরীক হয়ে তাকে শান্তনা দিবে। পক্ষান্তরে স্বামীর আনন্দ-উল্লাসের সময় নিজের অন্তরে আচ্ছাদিত দুঃখ-বেদনার কথা বা কোন পেরেশানীর ছাপ চেহারায় প্রকাশ পেতে দিবে না। স্বামীর নিকট তার

কোন আচরণের প্রতিবাদ বা অভিযোগ করবে না। কারণ, প্রথমটিতে মনের ব্যথা দূরীভূত হবে। আর দ্বিতীয়টিতে মনের ব্যাথা পুঞ্জীভূত হবে। তাই স্বামীর ব্যথায় তুমিও ব্যথিত হবে, আর তার আনন্দে তুমিও আনন্দিত হবে।

নবম ওসীয়ত
(স্বামীর ভক্তি-শ্রদ্ধা বজায় রাখা)

তিনি বলেন, আদরের কন্যা আমার! তুমি স্বামীর মান-সম্মান ও ইজ্জতের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। আর তাঁর মত, ইচ্ছা ও চাহিদা অনুযায়ী জীবন যাপন করবে। তাহলে তুমিও জীবনের ধাপে-ধাপে, প্রতিটি ক্ষণে-ক্ষণে তাকে উত্তমতর সাথীরূপে উপস্থিত পাবে।

দশম ওসীয়ত
(স্বামীর চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দেয়া)

তিনি বলেন, স্নেহের বেটী আমার! জেনে রাখ, যতক্ষণ তুমি স্বামীর সন্তুষ্টি ও আনন্দের স্বার্থে নিজের অন্তরকে দুঃখের দহনে দুগ্ধ করবে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের সন্তুষ্টির উপর, তার মনের কামনা-বাসনাকে নিজের কামনা-বাসনার উপর প্রাধান্য দিবে, (চাই তোমার পছন্দ হোক বা অপছন্দ) ততক্ষণ তোমার জীবন কাননে আনন্দ পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে থাকবে।

তিনি উপসংহারে বলেন ঃ প্রিয় কন্যা আমার! উল্লেখিত উপদেশ-ওসীয়ত সহ আমি তোমাকে আল্লাহ তা'আলার হস্তে অর্পন করছি। মহা মহিমাময় মহান আল্লাহ তা'আলা তোমার জীবনের প্রতিটি ধাপে ধাপে তোমার ভাগ্য লিপিতে মঙ্গলের সিদ্ধান্ত নিবেন এবং সর্বপ্রকার অশনি ও অমঙ্গল থেকে হিফাজত করবেন। (আমীন)

আরব্য মহিলার উল্লেখিত দশটি ওসীয়তের উপর যদি কোন স্ত্রী আমল করে, তাহলে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার সংসারকে জান্নাতের নমুনা বানিয়ে দিবেন। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পিয়ার-মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক হবে দৃঢ়, মজবুত, অটুট ও শক্তিশালী। প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনটাই পারস্পরিক সম্পর্ককে আজীবন দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার জন্য। একথা বাস্তব সত্য যে, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ও পারস্পরিক সম্পর্ক কাঁচা সুতার মত নয় যে, যখন ইচ্ছা ছিঁড়ে

ফেলা যাবে, কিংবা বালু-চরের খেলা ঘর নয় যে, যখন ইচ্ছা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়া যাবে। বরং এ বন্ধন হল জিন্দেগীভরের সওদা। মৃত্যু অথবা তালাক ব্যতীত এ বন্ধন ছিন্ন হয় না। সমস্ত জীবন এরই মধ্যে অতিবাহিত করতে হয়। যদি স্বামী-স্ত্রীর হৃদয়দ্বয় এক হয়ে যায়, যদি তাদের দু'টি প্রাণ একাত্মতা ঘোষণা করে, তাহলে পৃথিবীতে এর চেয়ে উত্তম নিয়ামত আর নেই। কুঁড়ে ঘরের মধ্যে তখন জান্নাতের নমুনা দেখতে পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে যদি দু'টি হৃদয় এক না হয়, তাহলে এ ভূপৃষ্ঠে এর চেয়ে মহামুসীবত, মহাআযাব আর নেই। রাজপ্রাসাদ আর চন্দনা পালঙ্ক থাকা সত্ত্বেও তখন পৃথিবীটা জাহান্নামের নমুনা মনে হবে।

বিবাহ-শাদীর পর দাম্পত্য জীবন সুখময়, আনন্দময় ও সাফল্যমন্ডিত বানাতে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বলতে গেলে নারীর হাতেই সবকিছু। সুতরাং যতদূর সম্ভব স্বামীর অন্তরকে আয়ত্বে এনে তাকে আপন বানিয়ে নিতেই হবে নারীকে। সম্পূর্ণরূপে স্বামীর রঙ্গে রঙ্গীন হতে হবে। তার ইচ্ছা মাফিক চলতে হবে। যদি স্বামী এরূপ আদেশ প্রদান করেন যে, রাতভর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে অথবা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে হবে, তাহলে ইহকাল-পরকালের ফায়িদা ও মঙ্গল এর মধ্যেই নিহিত যে, পার্থিব সাময়িক কষ্ট সহ্য করে পারলৌকিক অফুরন্ত সফলতা ও সীমাহীন নেয়ামত অর্জন করার নিমিত্ত তা-ই করা।

বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে নারী তখনই উচ্চ মর্যাদার সুউচ্চ আসনে সমাসীন হতে পারবে, যখন সে স্বীয় স্বামীর হৃদয় গভীরে নিজের স্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে। স্বামীর হৃদয়ে যে নারীর স্থান নেই, জগতবাসীর দৃষ্টিতে তার কি সম্মান থাকতে পারে? স্বামীর অন্তরে স্থান গেড়েই নারী জগতকে জান্নাত বানাতে পারে, পরকালের অফুরন্ত কল্যাণও অর্জন করতে পারে।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

স্বামীর হৃদয়কে আয়ত্বে নেয়া

স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনটা যেহেতু আজীবন পারস্পরিক সুসম্পর্ককে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে রাখার জন্য, তাই একটি বাস্তব সত্য কথা বলতে হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক ও সৌহার্দবোধ যদি পরিপূর্ণরূপে

বিদ্যমান থাকে, তাহলে দাম্পত্য সুখ-শান্তিও পূর্ণরূপে হাসিল হতে পারে। এটা ব্যতীত জীবন অসম্পূর্ণ ও দুঃখী বিবেচিত হয় সমাজের নিকট। তাই স্বামীর অন্তর জয় করার পন্থা শিক্ষা করা নারীর অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য; যা ব্যতীত গত্যান্তর নেই। নারী যতই শিক্ষিতা, সুশ্রী-সুন্দরী, রূপসী ও ধনী হোক না কেন, এ সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন রপ্ত করা ব্যতীত স্বামীর হৃদয়রাজ্যের রাণী হতে পারবে না।

তাই স্বামীকে আপন বানানোর জন্য তত্ত্ব ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কিছু কথা লিপিবদ্ধ করছি। যে সকল নারীরা স্বামীর খিদমত, সেবা-শুশ্রূষা ও মুহাব্বতকে স্বীয় ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করে, আর তাঁর পদতলে জীবন বিসর্জন দেয়াকে নিজের সফলতা মনে করে, তাদের জীবনকে শান্তিময়, সুখময় এবং আনন্দময় বানানোর জন্য এ কথাসমূহের উপর আমল করা অপরিহার্য। এসবই স্ত্রীর উপর কর্তব্য, যা স্বামীর হক ও অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। সেগুলো হচ্ছে-নারী জীবনে মাতা-পিতা ও স্বামীর চেয়ে আপন আর কেউ নেই। তাই স্বামীকে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, আপনের চেয়েও আপন মনে করতে হবে। স্বামী যদি গরীবও হন, তবুও তাকে ধনী এবং বিত্তশালী মনে করতে হবে। তাকে প্রাণভরে শ্রদ্ধা-ভক্তি করবে। প্রতিটি কার্জ-কর্ম তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী করবে। স্বামী যে কোন কাজ করতে বলবেন, দ্রুত সম্পাদন করে দিবে। তাঁর ইচ্ছা ও মতের বিরোধী কোন কাজ করবে না। সকল কাজে, সকল কথায় তাঁর সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখবে। নিজ সন্তুষ্টির উপর তাঁর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে। সকল সময় তাঁর সুখ-শান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। এমন কোন কথা বলবে না, যা তাঁর মনে ব্যথা দেয়। খুশী হয়ে স্বামী যা কিছু দিবেন, তা আনন্দচিত্তে কবুল করবে। যে কাজ করতে বলবেন, তা খুশী মনে এমনভাবে করবে, যেন তিনি চিন্তামুক্ত হয়ে যান।

স্বামীর অল্প আয়ে তুষ্ট থাকবে। অভাব-অনটনের কারণে তাঁকে তিরস্কার করবে না। তাঁর সম্মুখে মনমরা হয়ে ঘোরা-ফেরা করবে না। বরং ফুর্তির সাথে চলা-ফেরা করবে। সর্বদা হাসিমাখা চেহারায় নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করবে, যেন তোমাকে দেখে তাঁর হৃদয়টা আনন্দে বাগ-বাগ হয়ে যায় এবং সকল পেরেশানী দূর হয়ে যায়। স্বীয় প্রয়োজন সম্পাদনের পূর্বে তার প্রয়োজন সম্পাদন করবে। তাঁকে সাধ্যানুযায়ী সুস্বাদু খাদ্য আহার করাবে। পানাহারের পূর্বে নিজে তাঁর হস্ত ধৌত করাবে। স্বামী

গরীব হলে তার পরিধেয় বস্ত্র সম্ভব হলে নিজে সেলাই করে দিবে। তাঁর কাজ কর্মে সহযোগিতা করবে। নিজ হাতে তাঁর কাজগুলো করে দিতে চেষ্টা করবে। চা, পানি, নাস্তা পূর্ব থেকে প্রস্তুত রাখবে।

এমন কোন কথা বা কাজ করবে না, যাতে স্বামী পেরেশান হন। তাঁর সাধ্যাতীত কোন কিছুর ফরমায়েশ করবে না। কেননা, যদি তিনি তা আনতে না পারেন, তাহলে নিঃসন্দেহে মনস্তাপে ক্লিষ্ট হবেন। তবে সে জিনিষ নসীবে থাকলে, প্রাপ্ত হবেই। নিজ প্রয়োজন নিজেই সমাধান করতে চেষ্টা করবে। নিজের কোন কাজের জন্য তাঁকে আদেশ করবে না। যখন স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন নাকে নাকে কেঁদে তাঁর সম্মুখে কোন অভিযোগ করবে না। কারণ, জানা তো নেই, তিনি কেমন মেজাজে বাড়ী ফিরলেন এবং বাইরে তাঁর সাথে কি কি অবস্থা ঘটেছে।

স্বামীর পানাহারের প্রাক্কালে এমন আকর্ষণীয় ও মিষ্টিমাখা ভাষায় আলাপচারিতায় লিপ্ত হবে, যেন তিনি শান্তিতে তৃপ্তি সহকারে পানাহার করতে পারেন। কারণ, নীরবে শান্তিতে বসে ডাল-ভাত খাওয়া কোরমা-পোলাওর মতই মজাদার লাগে। আর অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে বিরিয়ানীও বে-মজা ও স্বাদহীন মনে হয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, কিছু কিছু বে-ওকুফ, বে-আকল ও বিবেক-বুদ্ধিহীন মহিলা এমনও রয়েছে- যারা স্বামী বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে সর্ব প্রথম অভিযোগ ও দুঃখের দাস্তান শুনাতে বসে যায়। স্বামীর পানাহার, উঠা-বসা ও বিশ্রামের কথা বে-মালুম ভুলে যায়। কষ্টের কাহিনী শুনিয়ে শুনিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অতঃপর স্বামী বেচারা নামকে ওয়াস্তে যৎসামান্য গলধঃকরণ করে উঠে চলে যেতে বাধ্য হয়। স্ত্রীর এহেন রসকষহীন আচরণে স্বামীও অসন্তুষ্ট হয়ে যান। আর মহান আল্লাহ তা'আলাও অসন্তুষ্ট হয়ে যান।

যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা দান করে থাকেন, তাহলে স্বামীর কাজে প্রাণ ভরে সহযোগিতা করবে। তাঁর কাজের বোঝা হালকা করবে। মিষ্টিমাখা ভাষা দ্বারা তাঁর পেরেশানী দূরীভূত করবে। তাঁর দুঃখে দুঃখী হবে, তাঁর সুখে সুখী হবে। যদি তাঁর উপর ঋণের বোঝা থাকে, তাহলে কারিগরী যোগ্যতা বা শিক্ষাগত যোগ্যতার উপার্জন দ্বারা তাঁর ঋণের বোঝা হালকা করতে চেষ্টা করবে। যদি তোমার ব্যক্তি মালিকানায় নগদ অর্থ-কড়ি বা অলংকার সঞ্চিত থাকে, তাহলে ঋণগ্রস্ত

স্বামীর নিকট উপস্থিত করে বলবে যে, আপনার ব্যক্তিত্বের তুলনায় এগুলো আমার নিকট কিছুই নয়। আপনি আছেন, আমার সব কিছুই আছে। এগুলো আপনি নিজ প্রয়োজনে খরচ করুন। আপনার দু'আ মাথা ছায়া যেন সর্বদা আমার মাথার উপর থাকে। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে, এর চেয়ে উত্তম সম্পদ দান করতে পারেন। অন্যথায় সব কিছু বেকার হয়ে যাবে।

দরিদ্র হওয়ার কারণে স্বামীর সেবা-যত্ন অবহেলা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে না। ঘরের কাজ-কর্ম নিজ হাতে করতে অভ্যস্ত হবে। এতে আশা করি, আল্লাহ তা'আলা সুখের দিন উপহার দিবেন। অভাব থাকলে সাংসারিক ব্যয় কম করবে, কৃচ্ছতার পথ অবলম্বন করবে। মাসিক যা কিছু উপার্জন হয়, তা থেকে সামান্য হলেও প্রতিমাসে কিছু কিছু সঞ্চয় করবে। সামান্য মনে করে উড়িয়ে দিবে না। নিজের পোশাক-পরিচ্ছদ নিজেই সেলাই করার চেষ্টা করবে। খাদ্য-খাবার নিজ হাতে তৈরী করবে। যতদূর সম্ভব বস্তীর বুয়া-মাসী দ্বারা খাদ্য রান্না করাবে না। সন্তানদের প্রতিপালন ও পরিচর্যা নিজেই করতে চেষ্টা করবে। স্বামী যদি কোন কারণ বশতঃ ক্রোধান্বিত হয়ে যান, তাহলেও তুমি ক্রোধান্বিত হবে না, বরং নম্রতার পথ অবলম্বন করবে। তাঁর ইচ্ছা ও মর্জি মুতাবিক চলবে। তাঁর চাহিদার উপর সন্তুষ্ট থাকবে। তোমার কাজ-কর্মে, আচার-ব্যবহারে তুষ্ট না হলেও তাঁর হক তুমি আদায় করতে থাকবে। এতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট থাকবেন। তিনি যতটুকু আয় উপার্জন করবেন, তা আমানতদারীর সাথে খরচ করবে। যথেচ্ছা অপব্যয় করবে না। নিজের কষ্ট হলেও তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ করবে।

স্বামীর সাথে এমন অমায়িক ব্যবহার করবে এবং লেন-দেন এমন পরিস্কার রাখবে, যেন আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী শুনলে খুশী হয়। এভাবে নারীরা ইচ্ছা করলে নিজ প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার পরশে মাটির ঘরকে সোনার চেয়েও খাঁটি বানাতে পারে। আবার তার জ্ঞানহীনতা, নির্বুদ্ধিতা ও সুষ্ট ব্যবস্থাপনায় অযোগ্যতার কারণে স্বর্ণকমল রাজপ্রাসাদও গোয়াল ঘরে পরিণত হতে পারে। তাই প্রজ্ঞা, যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা নারী জাতির জন্য অমূল্য রত্নরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে এই সুন্দর বসুন্ধরায়। সুতরাং তোমার ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্যের নক্ষত্র উদিত করতে তোমার প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে কখনও কৃপণতা করবে না। বরং রুটিন বাঁধা ও নিয়মবদ্ধ জীবন যাপন করতে অভ্যস্থ হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্ঞানবতী ও গুণবতী মেয়েরা কখনো দুর্ভোগে পড়ে না। তাদের পেরেশানী ও দুঃখ বহন করতে হয় না। অনিয়মতান্ত্রিক ও অনভিজ্ঞ মহিলারই কষ্ট-যাতণায় পতিত হয়। প্রতিনিয়ত তাকে অসংখ্য ধিক্কার ও ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হয়। কখনো শান্তি ও নিশ্চিন্তে দু'মুঠো খাওয়াও তার নসীবে জুটতে চায় না। সংসারে কাজ-কর্মের কোন পরিপাট্য, সুন্দর ব্যবস্থাপনা ও গোছগাছ না থাকার কারণে স্বামী বেচারা সর্বদা পেরেশানীতে কালাতিপাত করতে থাকেন। তাঁর নিকট স্ত্রী ও সংসারধর্ম সব কিছুই বিরক্তিকর মনে হয়। স্ত্রীর সামান্য ভুল ও অবহেলার কারণে সংসার পরিণত হয় জাহান্নামে।

কিন্তু সচেতন, সজাগ ও বুদ্ধিমতী স্ত্রী সর্বদা গৃহকে জান্নাত বানিয়ে রাখে। নিজেও সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করে এবং পরিবারের সকলেই নিশ্চিন্তে ও প্রশান্তিতে কালাতিপাত করে। বরং এমন নারীরা সংসারের সুখ-শান্তির মুল উৎসের ভূমিকা পালন করে। অনেক পুরুষ এমনও রয়েছে- যারা নারীর বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যের পরিবর্তে তার গুণের পাগল হয়ে থাকে। তাই বাতেনী গুণের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রতিটি নতুন স্ত্রীর কর্তব্য। কারণ, রূপ-লাবণ্য নারীর ক্ষণস্থায়ী সম্পদ। পক্ষান্তরে গুণ ও বুদ্ধিমত্তা তার দীর্ঘস্থায়ী পাথেয়।

সচেতন আদর্শ স্ত্রীরা! তোমরা স্বামীর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সন্তুষ্টির স্বার্থে নিজের আমিত্ব ও ক্রোধকে বিসর্জন দাও। বড়ত্ব, অহমিকা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বকে মোটেও প্রশ্রয় দিবে না। প্রতিবেশী বা পরপুরুষের সহিত আলাপচারিতায় লিপ্ত হবে না। কারো নিকট স্বামীর দুর্নাম করবে না। স্বামীর বদনাম হয়-এমন একটি শব্দও উচ্চারণ করবে না। তাঁর মনে যার আগ্রহ নেই, তা বিলকুল বর্জন করবে। রাগী স্বামীকেও সেবা-যত্ন ও আদর-সোহাগের মাধ্যমে আপন বানাতে চেষ্টা করবে। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলবে। এমন কাজ করবে, যাতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাঁর গোপনীয় বিষয়াদি কারো নিকট প্রকাশ করবে না। এমন সাজ-গোছ ও রূপচর্চা করবে, যেমনটি তিনি পছন্দ করেন। খারাপ ও দুশ্চরিত্রা নারীদের সংস্রব ত্যাগ করবে।

যদি উল্লেখিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আমল কর, তাহলে তোমার কিসমত আলোকোৎভাসিত হয়ে নক্ষত্রের মতই জ্বলজ্বল করবে। সবচেয়ে বড় কথা হল, তোমার স্বামী তোমার অনুগত হয়ে যাবেন। আর সর্বদা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকবেন। অধিকন্তু, তোমাকে নিয়ে অহংকার

করে প্রশান্তি লাভ করবেন। তোমাকে প্রেম-ভালবাসার সুখসাগরে ডুবিয়ে রাখবেন।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

এক স্বামী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা

নেককার ও আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য এই যে, সে সর্বাবস্থায় একজনকে নিয়েই জীবনযাপন করবে, একজনেরই হয়ে থাকবে। প্রথম স্বামী ব্যতীত দ্বিতীয় স্বামীর কল্পনাও করবে না। সুখ-সাচ্ছন্দ, আনন্দ উল্লাস, ভোগ-বিলাসের অবস্থা হোক অথবা দুঃখ-বেদনা, বালা-মুছীবতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক, গৃহ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ থাকুক বা দারিদ্রে ভরা, ভ্রমনে কিংবা গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় হোক না কেন? সর্বক্ষণ প্রাণপ্রিয় স্বামীকে পরামর্শ ও শান্তনার আঁচল দ্বারা আগলে রাখবে।

প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্য "যখন তোমার কেউ ছিলনা তখন ছিলাম আমি, এখন তোমার সব হয়েছে, পর হয়েছি আমি" এর মত যেন না হয় যে, স্বামীর যখন ধন-ঐশ্বর্য, মাল-দৌলত ছিল, তখন খুব মুহাব্বত, প্রেম-ভালবাসা, ইজ্জত-সম্মানে অন্তরটা গদ গদ করত। আর যখন স্বামী দারিদ্রতায় জর্জরিত হয়ে রিক্ত-সিক্ত হস্তে মুহ্যমান, তখন তার সাথে অপরিচিতের মত দুব্যবহার করা। ..... এহেন দুরাচরণে একথা সুস্পষ্ট হয় যে, সে ধন-সম্পদের স্ত্রী ছিল, অর্থাৎ সম্পদ ও মালকেই সে বিবাহ করেছিল। ঐ স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি, যাকে সে হেয় প্রতিপন্ন করছে।

জ্ঞানবতী জান্নাতী নারীগণ একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্ত স্বামীকে মন প্রাণ দ্বারা ভালবাসবে, তার প্রেম-ভালবাসা, মান-অভিমান আপন স্বামী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। পৃথিবীর কোন বস্তুকে সে পরওয়া করবে না। তার নিকট মাওলার রেজামন্দী ও সন্তুষ্টি বড় পাওয়া।

সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকাবৃন্দ!
গ্রন্থটি পাঠ করার সময় মুদ্রণগত বা ভুল বশতঃ কোন প্রকার ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবগত করানোর জন্য অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ!- গ্রন্থকার।

তাই সদা-সর্বদা স্বামীর ইজ্জত সম্মান করতে ত্রুটি করবে না। স্বামী যদি অসুস্থ হয়ে যায় অথবা সুস্থই থাকে, কোন অবস্থাতেই তাকে সেবা-যত্নের ত্রুটি উপলব্ধি করতে দিবে না; বরং স্বামীর মৃত্যুর পরও তার নির্দেশিত পথ মত চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। যেহেতু স্বামীর জীবদ্দশায় তার ইচ্ছা বিরুদ্ধে কোন কাজ করোনি, তাহলে তার মৃত্যুর পরবর্তী কালে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা কিভাবে করবে? তোমার আপত্তিকর ও অপছন্দনীয় আচরণে তোমার প্রানপ্রিয় মরহুম স্বামী বেহেশ্‌তবাসী আত্মা কি ব্যথিত হয়ে উঠবে না? তাহলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন চলবে? ইসলামী ইতিহাসের মহান ন্যায় বিচারক, সফল রাষ্ট্রপ্রধান হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর মহিয়সী স্ত্রীর নিকট তার ভাই প্রশ্ন করেছিল যে, যদি তুমি চাও, তাহলে তোমার বাজেয়াফত্‌কৃত অলংকার তোমাকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করি। তিনি বলেন, আমি যখন তার (স্বামীর) জীবদ্দশায় অলংকারে সন্তুষ্ট হয়নি, তখন তার মৃত্যুর পর ঐ ছাই এর প্রতি কি সন্তুষ্ট হব?

এমনই এক নেককার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে আরবের এক গ্রাম্য কবি খুব সুন্দর লিখেছেন যে, যখন তার গৃহে ক্ষুধা ও দারিদ্রতা প্রচন্ড রূপ ধারণ করেছিল, তখন তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কোন ধুধু প্রান্তরে বসে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছিল। স্বামী এ দুআ পড়ে পড়ে আকুতি-কাকুতি ও মিনতি প্রকাশ করছিল, হে আমার আল্লাহ! আমি এ মাঠ প্রান্তরে বসে আছি, যেমনটি আপনি অবলোকন করছেন। আমাদের উভয়ের উদর শূণ্য এবং আমরা ক্ষুধার্থ, যেমনটি আপনি জ্ঞাত আছেন। হে আমাদের পাওয়ারদেগার! আমাদের ব্যাপারে আপনার খেয়াল কি? আমাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করুন না?

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উল্লেখিত ঘটনায় স্ত্রীও যদি স্বামীর এহেন দারিদ্র পীড়িত পরিস্থিতিতে সামাল দিতে অসহায় স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে শান্তনার আঁচল বিছিয়ে না দেয় বরং ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকে, তাহলে স্বামী বেচারা মানসিক চাপে ব্যধিগ্রস্থ হতে পারে। এমনকি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বিকারগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে। স্বামীর ইহকালও নষ্ট পরকালও বরবাদ। যেমন- স্বামীর ব্যবসায় মন্দাভাব বা ব্যবসা লোপাট হয়ে গেছে অথবা চাকুরীচ্যুত হয়ে গেছে কিংবা ঋণ গ্রহিতাগণ টাকা হজম করে বসে গেছে, ... ইত্যাদি .... ইত্যাদি। এখন স্বামী বেচারা এত

টেনশনযুক্ত যে, সংসারের ঘানি কিভাবে চলবে, তার দশা বা কুল কিনারা পাচ্ছে না। তখন স্ত্রীর কর্তব্য এই যে, চিন্তাযুক্ত স্বামীর কপালের ঘাম সহানুভূতিমাখা আঁচল দ্বারা মুছে দিতে দিতে বলবে, "কোন চিন্তা ভাবনা করবেন না। টাকা-পয়সা তো হাতের ময়লা। আল্লাহ তাআলা ফিরিয়ে নিয়েছেন। তিনি পুনরায় ফিরিয়ে দিতেও পারেন। ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যে হয়ত কোন মঙ্গল নিহিত থাকতেও পারে। আপনি পাবন্দির সাথে নামায আদায় করতে থাকুন। চলতে ফিরতে "ইয়া মুগনী", "ইয়া গণী" পাঠ করতে থাকুন। দেখবেন, রিযিকের ব্যবস্থা খুব শিগ্রহ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

এখন পাঠকবৃন্দ বলুন, ঐ স্বামীর উপর যতই ঝড়-ঝাপটা আঘাত হানুক না কেন, যদি সে এমন শান্তনাদায়িনী সৌভাগ্যবতী স্ত্রী নসীবজোরে পেয়ে যায়, তাহলে সে পাহাড়সম বড় বড় পিবদাপদকে হিম্মত ও প্রবল মনোবল দ্বারা টলিয়ে দিতে পারবে। কঠিন কঠিন কার্যসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। শত চিন্তা ও পেরেশানীর মাঝেও তার সম্মুখে এমন এমন পন্থা ও পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়ে যাবে, যার কল্পনাও হয়ত সে কখনো করেনি। যার মাধ্যমে তার দুঃখ-কষ্টসমূহ আনন্দ-হরষে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। অসুস্থতা সুস্থতায় বদলে যেতে পারে। পেরেশানী খুশীর রূপ ধারণ করতে পারে। ভগ্ন হৃদয় সবল হয়ে যেতে পারে।

পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে এমনো কুটনী নারী রয়েছে, যারা স্বামীর দাম্পত্য জীবনে এক বিষাক্ত কালনাগিনীর ভূমিকা পালন করছে, যারা নিজ স্বার্থ হাসিলের নিমিত্ত স্বামীর অর্থ-সম্পত্তিকে চুষে চুষে খাচ্ছে। যারা স্বামীর সামান্যতম সুখ-শান্তির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেনা। ধিক!! এমন নারীদের প্রতি।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

একমাত্র স্বামীরই মাস্তানা-দিওয়ানা হওয়া

আদর্শ ও নেককার স্ত্রীর একটি মহৎগুণ এটি যে, সে একমাত্র স্বামীর দেওয়ানা হবে। প্রেম-ভালবাসার আবেগে তার মধ্যে যে মাস্তানা ভাব প্রকাশ পাবে, তাও একমাত্র স্বামী রেজামন্দীর নিমিত্ত। আর এ দেওয়ানা-মাস্তানাভাব মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হতে হবে। কারণ, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "যে নারী এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে, তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট, তাহলে সে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

- তিরমিযী, ১ঃ২১৯

জান্নাতী নারীদের গুণসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, সে আনতনয়না ও পর্দাশীলা হবে। স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি মন ঝুকাবে না, মন বসাবে না, সাজ-সজ্জা করে অন্যকে স্বীয় রূপ-লাবণ্য উপহার দিবে না। পরপুরুষদের সম্মুখে আপন রূপ ও সৌন্দর্যের ঝলক দেখাবে না। বেগানা পুরুষদের আকৃষ্ট করার জন্য কথা বলার ভাব-ভঙ্গিমা নমনীয় ও চিত্যাকর্ষক বানাবে না।

সুতরাং জ্ঞানবতী, গুণবতী আদর্শ স্ত্রীদের কর্তব্য এই যে, পরপুরুষদের প্রতি একেবারেই দৃষ্টিপাত করবে না। বরং স্বামীর প্রতি প্রেম-ভালবাসা ভরা, মায়ামাখা, মধুমাখা, মনহরণী ও মায়াবী দৃষ্টিতে তাকাবে। আপন দৃষ্টি সর্বদা স্বামীর প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। বেকার, অনর্থক ও নিষ্প্রয়জনীয় কাজের জন্য বাড়ির বাইরে বের হবে না। শুধু এবং শুধু স্বামীরই হয়ে থাকবে। স্বামীর হয়ে বাঁচবে এবং স্বামীর হয়ে মরবে। অন্য কারো জন্য নয়।

এখন আমরা পাঠক/পাঠিকাদের অবগতির জন্য একটি বাস্তব সত্য ও শিক্ষণীয় ঘটনা উল্লেখ করছি। এতে জানা যাবে যে, একজনেরই হয়ে জীবন যাপন করার মধ্যে কত লাভ।

ইসলামী ইতিহাসে বাদশা হারুনুর রশীদের নাম নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। ন্যায়-নিষ্ঠা, ইনসাফ ও ইসলামী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তিনি অতি প্রসিদ্ধ একজন মুসলিম বাদশাহ ছিলেন। তার একজন আফ্রিকান নিগ্রের মত কালো কুচকুচে দাসী ছিল। হারুনুর রশীদ তাকে এবং সে হারুনুর রশীদকে সীমাহীন ভালবাসতো। তবে রাজা আর দাসীর এ ভালবাসাবাসীকে অন্যান্য দাসীরা স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। তাদের অন্তরে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার দাবানল প্রতিনিয়ত দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। তারা হরহামেশা এদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ধুম্রজাল বুনতে

আর সর্বপ্রকার অপচেষ্টা চালাতে থাকে। হারুনুর রশীদ তাদের এ ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা গোপনসূত্রে জানতে পারেন। তখন তিনি পরীক্ষার জন্য একবার দস্তরখানের উপর স্বর্ণ-রূপা, হিরা ও মূল্যবান মণি-মুক্তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাব রেখে দিলেন। অতঃপর ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে, "আজ বাদশার ধনভান্ডার সকলের জন্য উন্মুক্ত। হাত দিয়ে যে যেটা ধরবে, সে তার মালিক হয়ে যাবে।" সঙ্গে সঙ্গে সকল দাস-দাসী ঐ মণি-মুক্তা আর দেরহাম-দানানীর সংগ্রহে অতিব্যস্ত হয়ে হুড়মুড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কিন্তু কালো দাসীটি বাদশার পাশে স্থীর অনড় হয়ে স্বস্থানে দাড়িয়ে রইল। আর হারুনুর রশীদের প্রতি একনেত্রে তাকিয়ে থাকল। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মণি-মুক্তা, হিরা-জওহার কেন কুড়ালে না? উত্তরে দাসী বলল, "যে যেটা স্পর্শ করবে সে তার মালিক হয়ে যাবে"-এ ঘোষণা কি ঠিক? বাদশা বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বৈ। দাসী উঠে দাড়াল এবং বাদশার কাঁধে হাত রেখে বলল, আমার উদ্দেশ্য ও চাহিদা হল মণি-মুক্তা ও হিরা-জওহারের মালিক অর্থাৎ স্বয়ং আপনি। যদি বাদশা আমার সাথে না থাকে, তাহলে এ সব কিছুই আমার না। তখন বাদশা সুন্দরী সুন্দরী দাসীদেরকে ঐ কালো কুৎসিত দাসীর প্রসংশনীয় আচরণ ও বুদ্ধিমত্তা বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে বুঝিয়ে দিলেন যে, দাসীর একনিষ্ঠ ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও বুদ্ধিমত্তার কারণেই তিনি একজন কুশ্রী কালো দাসীকে ভালবাসেন। বাদশা এও বলে দিলেন যে, যদিও সে রূপ-লাবণ্যে অনাকর্ষণীয়, কিন্তু সে আমাকে আন্তরিকভাবে ভালবেসেছ। আর তোমরা আমাকে নয় বরং আমার বাদশাহী ও আমার ধন-দৌলতকে ভালবেসেছ।

উল্লেখিত ঘটনায় একটি বিষয় শিক্ষণীয় হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে ভালবাসেন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি এক আল্লাহর হয়ে যাবে, আল্লাহও তার হয়ে যাবেন।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ
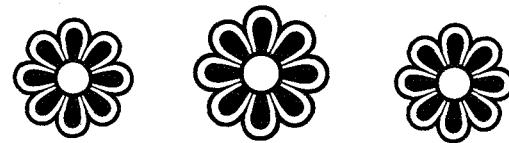
স্বামীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখা

প্রত্যেক স্বামী কোন কোন জিনিষ পছন্দ করে, কোন কোন জিনিষ বা কাজ অপছন্দ ও ঘৃণা করে। বুদ্ধিমতী আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য এই যে, তার ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, চাহিদা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা, মন-মানসিকতা যেন প্রাণপ্রিয় স্বামীর মতই হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তবে শরীয়ত পরিপন্থি না হয়, তার প্রতি সচেতন থাকা। স্বামীর সন্তুষ্টির নিমিত্ত আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা যাবে না। সদা-সর্বদা এই প্রচেষ্টা করবে, যেন স্বামীর মুখ থেকে বের হওয়ার পূর্বেই ঐ কাজগুলো করে ফেলবে। চলা-ফেরা, উঠা-বসা, থাকা-খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিধান, সাজ-গোছ ইত্যাদি ঐ পদ্ধতিতে করবে, যেমনটি স্বামী মহোদয় পছন্দ করেন। প্রাণপ্রিয় স্বামীর অন্তরে স্থায়ী প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা প্রথিত করা একটি কার্যকরী মহৎগুণ। রূপ-লাবণ্য, আহামরি সুশ্রী সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য মাত্র ক'দিনের অতিথি। অতিথির মত রূপ-লাবণ্যও একদিন বিদায় নিতে বাধ্য হবে। তবে রয়ে যাবে গুণ ও ব্যবহার। তাই মহৎগুণ অর্জনে প্রতিটি আদর্শ স্ত্রীকে সচেষ্ট হতে হবে।

এ কথাটি স্মরণ রাখবে যে, স্ত্রী স্বামীর সাথে যতটুকু অন্তরঙ্গ, ফ্রী এবং স্বাভাবিক হবে, ততটুকুই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালবাসা গাঢ় থেকে প্রগাঢ় ও টেকশই হবে। অধিকন্তু, পারস্পরিক ইজ্জত, সম্মান, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। প্রেম-ভালবাসা স্থায়িত্ব হবে। পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও ভুল বুঝাবুঝি দূর হবে। সবচেয়ে বেশী আকর্ষণীয় বিষয় হল, মিয়া-বিবির মনের মিল বাড়বে বহুগুণ।

নিঃসন্দেহে একটি কথা বলা বাহুল্য, যদি কারো এমন স্ত্রী ভাগ্যে জোটে, যার অমায়িক ব্যবহারের চোটে স্বামীর ঠোটে হাসি ফোটে, তাহলে সে স্বামী অর্ধজগতের অধিপতি হয়ে যাবে বটে। বুদ্ধি-বিবেকহীন কোন যুবকও যদি এমন একজন নেককার স্ত্রী প্রাপ্ত হয়, তাহলে সে আপন স্বামীকে জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিত্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। এমন ব্যক্তি একদিন না একদিন জগতের জনসেবা, কল্যাণ ও প্রজ্ঞাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। পক্ষান্তরে জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবি ব্যক্তিত্বের ভাগ্যেও যদি মূর্খ, বাচাল, বুদ্ধিহীন বা নাফরমান স্ত্রী জোটে, তাহলে সে জগতের বিবেক-বুদ্ধিহীন লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতে পারে।

এ বিশ্ব জগতের খোশ কিসমত, ভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন হলেন কাজী শুরাইহ (রাঃ)। বিশিষ্ট ইসলামী বুদ্ধিজীবী ইমাম শা'বী (রাঃ) একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়ির অবস্থা কেমন?

তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ আমাদের দাম্পত্য জীবনের বয়স কুড়ি বৎসর। স্ত্রীর পক্ষ থেকে একদিনের জন্যেও এমন কোন আচরণ পাইনি, যা আমাকে ক্রোধান্বিত বা অসন্তুষ্ট করে।

ইমাম শা'বী প্রশ্ন করলেন, তা আবার কেমন করে? কাজী শুরাইহ (রাঃ) বললেনঃ বাসর রাতে প্রথম যখন স্ত্রীর নিকট পৌঁছলাম, তখন থেকেই আমাদের মনের মিল এমন হল যে, আজ পর্যন্ত আমরা "দু'টি দেহ একটি মন" হিসেবেই জীবন যাপন করছি। প্রথম রাত্রে স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যখন গেলাম, তখন দেখলাম, আমার স্ত্রী কল্পনাতীত সুশ্রী ও সুন্দরী। মনে মনে ভাবলাম, এমন সুন্দরী স্ত্রী পেলাম, তাই শুকরিয়া স্বরূপ দু'রাকাআত নামায পড়ে নেই। নমায পড়ে যখন আমি সালাম ফিরালাম, তখন দেখলাম, সেও আমার সাথে নামায পড়ছে এবং আমার সালাম ফিরানোর পর সেও সালাম ফিরাচ্ছে। দু'আর পর যখন আমি তার প্রতি স্বীয় হস্ত প্রসারিত করলাম, তখন সে কোমল কণ্ঠে বলল, আবু উমাইয়্যা একটু ধৈর্য্য ধরুণ। অতঃপর সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমি তাঁরই প্রশংসা করছি। আমি তাঁর হামদ বর্ণনা করছি এবং জীবনের প্রতিটি বিপদ সঙ্কুল ঘাটি এবং প্রতিটি দুর্গম পথে তারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করছি, যেন তিনি তাঁর প্রিয় রাসূল (সাঃ) এর উপর রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর পরিবার পরিজনের উপর।

হে আমার প্রাণপ্রিয় মাথার মুকুট! আমি একজন সরল-সোজা অবলা নারী। আপনার মনের চাহিদা, অন্তরের কামনা, হৃদয়ের বাসনা সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। আপনার আকাঙ্খা, কামনা, বাসনা, চাহিদা ও পছন্দ সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। যে কাজটি আপনার পছন্দনীয়, আমি জীবনভর সেটি করব। যেরূপ কথা-বার্তা আপনার ভাল লাগে, আমি আজীবন সেরূপ বলব। যে কাজ বা আচার-আচরণ আপনার অপছন্দনীয়, তা থেকে আমি অবশ্যই বিরত থাকব।

...... সে পুনরায় বলল, আপনার বংশে বা গোত্রে অসংখ্য মেয়ে এমন ছিল, যাদেরকে আপনি ইচ্ছা করলে বিবাহ করতে পারতেন। এমনিভাবে আমার বংশে বা গোত্রে অসংখ্য মেয়ে এমন ছিল, যাদেরকে আপনি বিবাহ করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সিদ্ধান্ত নেন, তখন তা পূর্ণ হয়েই যায়। আপনি এখন আমার মাথার তাজ, জীবনসঙ্গী। আমি আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আপনি তাই করুন, আল্লাহ তা'আলা যা অন্য সকল মুসলমানদের আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ আমাকে পছন্দ হলে উত্তমরূপে গ্রহণ করুন, যত্ন করে রাখুন, অন্যথায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিদায় দিন। আমার আরজ এখানেই সমাপ্ত। আমি আল্লাহ তা'আলার শাহি দরবারে গুনাহ থেকে ক্ষমা চাচ্ছি, আমার জন্য এবং আপনার জন্য।

হযরত কাজী শুরাইহ (রাঃ) স্বীয় নতুন স্ত্রীর মধুমাখা জ্ঞানগর্ভ কথা শ্রবণ করে বিমোহিত হয়ে বলেন, আমি যখন তার হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য শ্রবণ করলাম, তখন আমিও ঐ বিষয়ভিত্তিক কিছু আলোচনা করতে বাধ্য হলাম। আমি স্ত্রীর বক্তব্যের উত্তর এবাবে দিলাম,

মহান আল্লাহর প্রশংসা এবং মহানবী (সাঃ) এর উপর দরূদের পর হে আমার প্রাণপ্রিয় জীবনসঙ্গিনী! তুমি যে ঈমানদীপ্ত, মনমাতানো আলোচনা রেখেছ, যদি তুমি স্বীয় কথায় অটুট, অবিচল ও দৃঢ় থাক, তাহলে তা হবে তোমার জন্য বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। যদি তুমি আপন কথা থেকে হটে যাও, তাহলে তুমি দ্বিগুণ অভিযুক্ত হবে। আমি .... অমুক .... অমুক জিনিষ ও কাজ পছন্দ করি। সুতরাং তুমি তা গ্রহণ করবে। আমি অমুক .... অমুক কাজ অপছন্দ করি। সুতরাং তুমি তা .... থেকে বিরত থাকবে। তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি এই মর্মে যে, তুমি যে কোন মঙ্গলজনক বা নেকীর কাজ দেখবে, তা প্রচার-প্রসার করতে যত্নবান হবে। আর যে মন্দ ও দোষের বস্তু দেখবে, তখন তাকে পর্দা দ্বারা অবৃত করে দিবে।

আমার বক্তব্য শেষে আমার নবপরিণতা স্ত্রী আমাকে বলল, আমাদের পরিবারের কাকে কাকে আপনি ভালবাসেন এবং কার সাথে আপনার কেমন মুহাব্বত? আমি বললাম, অমুক...., অমুক.... আমার আত্মীয়, কিন্তু আমি চাইনা যে, তাদের নিকট এত বার যাও, যাতে করে তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অতঃপর সে বলল, আপনার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আপনি কাদেরকে পছন্দ করেন, যাদেরকে আমি বাড়িতে আসতে দিব? আর কাকে

অপছন্দ করেন? আমি তাদের নিকট অক্ষমতা প্রকাশ করব। তখন আমি বললামঃ অমুক অমুক আমার আত্মীয় নেককার। আর অমুক অমুক আত্মীয় হেদায়াতের জন্য দু'আ পাওয়ার উপযুক্ত। সুতরাং তাদের থেকে নিজেকে সংরক্ষিত রাখবে।

অতঃপর হযরত ইমাম শাবী বলেন, আমি তাঁর সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেছি, কিন্তু কখনো এমন সুযোগ আসেনি যে, আমি তাকে শাসন করব, তবে মাত্র একবার। সেই একবারের শাসনেও বাড়াবাড়ি আমার পক্ষ থেকেই হয়েছিল।

সুতরাং, নেককার আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য এই যে, সে সর্বদা স্বীয় প্রাণপ্রিয় স্বামীর বাধ্যগত থাকবে। স্বামীর "হা" তে "হাঁ" মিলাবে, আর "না" তে "না" মিলাবে। এমন নারীর স্বামীই কাজী শারইর মত মহান ব্যক্তিত্বরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। যার ভাগ্যে এমন স্বামীভক্তা সতী-সাধবী স্ত্রী জুটবে, তার গৃহে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হলে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হলে, নববধূ ও নববর দাম্পত্য জীবনের প্রারম্ভ হতেই পারস্পরিক মেজাজ, চিন্তা-চেতনা ও মনের চাহিদা সম্পর্কে আলোচনা করে নিবে। যাতে করে একে অপরের পছন্দ বস্তুগুলো ও কাজগুলো জেনে নিতে পারে এবং তা মেনে নেয়া, সয়ে নেয়া ও গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয়ে যায়। হযরত কাজী শুরাইর স্ত্রী প্রথম রাত্রেই জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে যে, স্বামীর কি কি পছন্দনীয় এবং কি কি অপছন্দনীয়? কোন ধরনের আত্মীয়দের স্বামীর বাড়িতে প্রবেশ করার অনুমতি আছে, আত্মীয়দের সম্পর্কে স্বামীর মন-মানসিকতা কেমন? প্রবাদ বাক্যটি বাস্তব সত্য যে, প্রত্যেক মহান ব্যক্তি গঠনে কোন না কোন নারীর অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্ব বিখ্যাত ন্যায় বিচারক হযরত কাজী শুরাইহ হলেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

স্বামীর মনোরঞ্জনে খুশবু ব্যবহার করা

গুণীজনরা বলেন, আদর্শ স্ত্রীর জন্য লক্ষণীয় বিষয় এই যে, স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য মাঝে মাঝে এমন সুগন্ধী ব্যবহার করবে, যা সে পছন্দ করে। কারণ, স্বামীর দৃষ্টিতে আকর্ষণীয়, কামনীয় হওয়ার জন্য সাজ-

সজ্জা করা, খুশবুদার আতর ব্যবহার করা পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা বৃদ্ধির জন্য বড় কার্যকরী পদক্ষেপ। অধিকন্তু, এর দ্বারা পারস্পরিক ঘৃণা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যবোধ ও দূরত্ব দূরীভুত হয়। আতর ও খুশবুজাতিয় দ্রব্য অন্তরে চাঞ্চল্য ও স্ফুর্তী সৃষ্টি করে। এর দ্বারা ফেরেশতারা শান্তি পায়। কেননা, নাসিকার মত চোখও অন্তরের প্রতিনিধি এবং তার দরওয়াজা। কোন বস্তু যখন দৃষ্টিতে শোভনীয় মনে হয় অথবা কোন দৃশ্য অপরূপ সুন্দর অনুমেয় হয়, তখনই দৃষ্টি তাকে সরাসরি অন্তরে পৌঁছে দেয়।

পক্ষান্তরে, যখন কোন কুশ্রী দৃশ্য স্বামীর সম্মুখে দৃষ্ট হয়, যেমন-স্ত্রীর ময়লা, অপরিষ্কার পরিচ্ছদ বা চেহারা কিংবা অগোছালো কেশগুচ্ছের প্রতি দৃষ্টিপাত হয় আর অন্তরে এর প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হয়, তখন স্বামীর অন্তরে ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও অভক্তিভাব ফুঁসে-ফেঁপে ওঠে। এ জন্য কোন যুগে আরবের মেয়েরা একে অপরকে তাকিদ করত যে, কোন অবস্থায় যেন তোমার স্বামীর দৃষ্টি অন্য কোন নারীর প্রতি পতিত না হয় এবং তোমার ময়লামুক্ত অবয়ব বা পোশাকের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়ে তোমার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি না হয়। এ থেকে বেঁচে থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। - ফয়জুল কাদীর

আতর ও খুশবুর গুরুত্ব এবং এর মনমাতানো সুপ্রতিক্রিয়ার কারণে মহানবী (সাঃ) নারীদেরকে সুগন্ধী বা আতর মেখে পথে-ঘাটে, বাজারে বের হতে বারণ করেছেন। যাতে করে পুরুষরা আকৃষ্ট হয়ে তাদের অন্তরে কুকর্মের আগ্রহ জাগ্রত না করে। আর তাদের অন্তর যেন কোন অশুভ চক্রান্ত দ্বারা আক্রান্ত না হয়।

পুরুষদের সুগন্ধী এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়, যার খুশবু বেশী আর রং কম। পক্ষান্তরে নারীদের সুগন্ধী এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, খুশবু হবে কম আর রং হবে বেশী। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের এ পৃথিবীতে আমার পছন্দনীয় সামগ্রী হল নারী জাতি এবং সুগন্ধী। আর নামাজের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে। - নাছায়ী শরীফ

খোদাভীরু মহিলাদের কর্তব্য এই যে, কোথাও বেড়াতে গেলে খুশবু ছড়ায় এমন গাঢ় প্রসাধনি ব্যবহার পরিহার করা আবশ্যক। এতে বেগানা পুরুষরা আর সমাজের বখাটে যুবকেরা আকৃষ্ট হয়ে অঘটন ঘটানোর জল্পনা আর কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে। রূপচর্চা আর সাজ-সজ্জা করে

পুরুষদের চোখের পলকে ঝলক দেখিয়ে, বখাটে যুবকদের ঠমক আর চমক দেখিয়ে তাদের দেমাগ বিগড়ে দেয়া কোন কৃতিত্ব নয়। বরং এ জাতির কৃতিত্ব সতীত্ব হরণের সহায়ক হয়। সতীত্ব হরণের দায়-দায়িত্ব বে-হায়া নারীকেই বহন করতে হয়। তাই রূপচর্চা ও বৈধ সাজ-সজ্জা নিজ গৃহে একমাত্র প্রাণপ্রিয় স্বামীর জন্যই করা যেতে পারে। এতে উভয় জগতের উপকার রয়েছে।

আদর্শ স্ত্রীর জন্য কর্তব্য পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে, নিয়মিত গোছল করা, অযু করা এবং দাঁত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, বিশেষ করে সুগন্ধী ব্যবহার করা। এতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালবাসা ও মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। মন-মস্তিষ্কের জন্যও সুগন্ধী (আতর) খুবই উপকারী। ফেরেশতাগণও আতরের সুগন্ধী পছন্দ করেন।

নেক ও বুদ্ধিমতি আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য এই যে, মিষ্টি মিষ্টি ঘ্রাণের ভাল ভাল আতর আপন স্বামীকে নিজ হাতে লাগিয়ে দিবে। স্বামীর কাপড়ে, পোশাকে, টুপিতে, রুমালে আতর মাখিয়ে দিবে। কেননা, এটাও একটা সুন্নত আমল। এতে পার্থিব উপকার এই হবে যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুসম্পর্কে উন্নতি সাধিত হবে। আর সুন্নতের নিয়্যতে আমল করলে পরকালে অনেক বেশী ছাওয়াব প্রাপ্ত হবে। মুসলিম শরীফে হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "আমি হুজুর আকরাম (সাঃ) কে খুশবু মেখে দিয়েছি, যখন তিনি (সাঃ) এহরাম বাঁধলেন (অর্থাৎ এহরাম বাঁধার পূর্বে) আর যখন হজ্জের আরকান থেকে অবসর হলেন, তখন তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সবচে' উত্তম যে খুশবু আমার নিকট ছিল, তা আমি নবীজী (সাঃ) কে মাখিয়ে দিলাম।"

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, "আমি নবীজী (সাঃ) কে দু'হাতে খুশবু লাগিয়ে দিয়েছি, যখন তিনি এহরাম বাঁধছিলেন (অর্থাৎ এহরামের নিয়্যতের পূর্বে)"।

যখন হুজুর (সাঃ) এ'তেকাফে ছিলেন, আর হযরত আয়িশা মাসের ক'টা দিনের কারণে মসজিদে আসতে পারতেন না, তখন নবীজী (সাঃ) আপন মস্তক হুজরা শরীফের নিকটবর্তী করে দিতেন আর তখন হযরত আয়িশা (রাঃ) চিরুনী দ্বারা মাথা আঁচড়িয়ে দিতেন এবং মাথা ধৌত করে দিতেন।

সুতরাং আপনিও আপনার স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। জুমআর দিন এবং অন্যান্য দিন নামাযে যাওয়ার পূর্বে নিজ হাতে স্বামীর শরীরে, পোশাক খুশবুদার আতর মেখে দিন। জীবনে একবার হলেও উক্ত সুন্নতের উপর আমল করুন। দেখবেন, দুনিয়াতেও শান্তি, আখেরাতেও শান্তি। বরং দুনিয়াতে ও জান্নাত আখেরাতেও জান্নাত। অর্থাৎ গৃহকানন জান্নাতের মতই আনন্দঘণ লাগবে। স্বামীর সেবা-যত্নের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করলে দুনিয়াও জাহান্নাম, আখেরাতও জাহান্নাম। স্বামী তার স্ত্রীর জন্য জান্নাত বা জাহান্নাম। তার প্রমাণ আমরা একটি হাদীস দ্বারা জানতে পাই।

"মুসনাদে আহমদ" নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত হুসাইন ইবনে মুহসিন (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, "আমার ফুফু আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি একদা মহানবী (সাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হলাম। যখন আমি আমার কথা পূর্ণ করলাম, তখন নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, তুমি কি বিবাহিতা? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার (স্বামীর) সাথে তোমার আচরণ কেমন? আমি বললাম, তার আনুগত্যে আমি কোন প্রকার অবহেলা করি না। তবে নিজের পক্ষ থেকে কোন কাজ করতে অক্ষম হওয়া ব্যতীত। ইরশাদ করলেন, গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ, তুমি তার সাথে কেমন আচরণ করছ? কেননা, সে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।'

হুজুর (সাঃ) উক্ত মহিলাকে উপদেশ দিলেন এই বলে যে, তুমি নিজেকে ভাল করে দেখে নাও, স্বামীর দৃষ্টিতে তোমার মর্যাদা কতটুকু? তুমি স্বামীর অধিকার আদায় করেছ কিনা? এটাই তোমাকে জান্নাতে পৌঁছানোর কারণ হবে। আর যদি স্বামীর হক আদায় করতে ত্রুটি বা অবহেলা হয়ে যায়, তাহলে যেভাবেই হোক স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর যতটুকু তার অন্তরে ব্যথা দিয়েছ, তারচে বেশী তাকে সন্তুষ্ট করতে প্রয়াস চালাবে এবং এস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

স্বামীর অধিকার সম্পর্কিত একটি হাদীস তিরমিযী ও ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত হয়েছে। "লক্ষ্য করে শ্রবণ কর! তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের কিছু অধিকার রয়েছে। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদের উপর অধিকার এই যে, তারা তোমাদের বিছানায় এমন লোকদের পা রাখতে দিবেনা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর এবং তোমাদের গৃহে এমন লোককে প্রবেশ করতে দিবেনা, যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর।"

সুতরাং, প্রতিটি মুসলমান নারীর অত্যাবশ্যক কর্তব্য এই যে, সে বেগানা পুরুষ থেকে বেঁচে থাকবে। তার সাথে হাসী-ঠাট্টা, রং-তামাশা, বে-পর্দা কথা-বার্তা বলা এবং গৃহাভ্যন্তরে এনে আপ্যায়ন করানো থেকে বিরত থাকবে। বিশেষ করে স্বামী যখন গৃহে অনুপস্থিত থাকে। এমনিভাবে বিনা অনুমতিতে বা অসময়ে প্রতিবেশীর গৃহে প্রবেশ করা অথবা প্রতিবেশী না-মাহরাম পুরুষদের গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রদান, তাদের সাথে অন্ত রঙ্গতা, তাদের সাথে মুচকী হাসী বিনিময়, বান্ধবীর কিংবা প্রতিবেশীর স্বামীর সাথে দহরম-বহরম সম্পর্ক রাখা, প্রতিবেশীর বালেগ ছেলের সাথে ফ্রী মাইন্ডে আলাপচারিতা, অতঃপর সংগোপনে কথোপকথন, অতঃপর আবেগপ্লুত সংলাপ করা....... ইত্যাদি সবকিছু স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্কের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এহেন বিষাক্ত কার্যকলাপ থেকে নিজেকে নিবৃত রাখা একান্ত কর্তব্য। সুসম্পর্ক বিধ্বংসী এসকল বিষয় হতে তেমনিভাবে বাঁচতে হবে, যেমনিভাবে বিষাক্ত সাপ বা হিংস্র জন্তু হতে বাঁচা হয়। কারণ, এ সকল কার্যকলাপ হতে সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলশ্রুতিতে অনেক নারীকে "তালাক প্রাপ্তা" উপাধিতে ভূষিত হতে হয়েছে। অসংখ্য ঘটনা এমন ঘটেছে যে, অনাকাঙ্খিতভাবে বা আকস্মিকভাবে স্বামী বাড়িতে ফিরে এসে দেখে, তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে প্রাণ লেন-দেনে ব্যস্ত অথবা হৃদয় বিনিময়ে ন্যস্ত। স্ত্রীর টনক নড়ে তখন, যখন স্বামীর মুখ থেকে ক্রোধাগ্নি মাখা সর্বনাশা "তালাক" শব্দটি উচ্চারিত হয়ে যায়।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

স্বামীকে প্রেমাডোরে বেঁধে রাখা

স্বামী-স্ত্রীর প্রেমই প্রকৃত প্রেম। বিবাহের পূর্বে যে রোমাঞ্চকর প্রেম হয়, তা শুধু কৃত্রিম ও রঙ্গীন স্বপ্ন বৈ নয়। আর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয় খুব

কম। স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে প্রেম-ভালবাসামাখা আচরণ করে, স্বামীর আনুগত্য করে, প্রতিটি কাজে স্বামীর পরামর্শ গ্রহণ করে, স্বামীর প্রতিটি আদেশ দাসীর মত পালন করে, তাহলে ঐ স্ত্রী আপন স্বামীকে দেওয়ানা বানিয়ে নিতে পারে। স্বামীকে গোলাম এবং মনীব উভয়টা বানিয়ে নিতে পারে। স্ত্রী যদি স্বামীর সেবিকা হয়ে যায়, তাহলে স্বামীও স্ত্রীর সেবক হতে বাধ্য। কিন্তু প্রথম প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, অনেক ধৈর্য্যধারণ ও কষ্ট সহ্য করতে হবে, অনেক কথা মেনে নিতে হবে, অনেক অধিকার বিসর্জন দিতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রেমের নিদর্শন নবীজী (সাঃ) তনয়ী, আদরের দুলালী হযরত যয়নাব (রাঃ)। হযরত যয়নাব (রাঃ) স্বীয় মা জননী নবীপত্নী হযরত খাদীজা (রাঃ) থেকে ঐ সমস্ত গুণাগুণ ও আদর্শ শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি আপন স্বামীকে বন্ধুরূপে, সুখ-দুঃখের সাথীরূপে, বিপদাপদে সাহায্যকারীরূপে, সহমর্মী, জীবনসঙ্গীরূপে বানিয়ে নিয়েছিলেন।

আরবের কোরায়েশরা যখন তার স্বামী (তখনো কাফের) আবুল আ'সকে বলেছিলঃ তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। অতঃপর কোরায়েশদের মধ্য থেকে যে তরুণীকে তুমি বিবাহ করতে পছন্দ করবে, তার সাথেই তোমার বিবাহের ব্যবস্থা আমরা করব। কিন্তু (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মদের (সাঃ) কণ্যাকে নিজ গৃহে রেখোনা। কিন্তু আবুল আ'স (তখনও মুসলমান হয়নি) বলল ঃ "কখনও নয়, আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি নবীর (সাঃ) কন্যাকে ত্যাগ করতে পারিনা এবং আমি এটা পছন্দ করিনা যে, আমার স্ত্রী (যয়নাবের) বিনিময়ে অন্য কোন কুরায়িশ নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করি।"

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে, প্রেম-ভালবাসা দিয়ে স্বামীর অন্তরে কেমন শক্ত মজবুত স্থান তৈরী করে নিয়েছে যে,

কুরাইশ গোত্রের অর্থাৎ স্বগোত্রের লোকেরা স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য শত পীড়াপীড়ি ও চাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও আবুল আ'স উত্তরে বলছে, "যয়নাব" বিনে অন্য নারী না-মঞ্জুর। যয়নাবের সাথে অন্য নারীর তুলনাই হতে পারে না। আমি যয়নাবের বিনিময়ে অন্য কোন নারী গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।" এতে বুদ্ধিমতী স্ত্রীদের জন্য অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে।

এমনিভাবে বনী উযরাহ গোত্রের এক গ্রাম্য যুবকের সাথে জনৈকা পরমা সুন্দরী এক যুবতীর বিবাহ হয়। যখন ঐ গ্রাম্য যুবকের নিকট ধন-দৌলত ফুরিয়ে এল, তখন কন্যার পিতা জোর করে কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তখন স্বামী বেচারা শাসক মানওয়ানের নিকট ন্যায় বিচারের জন্য গেল। মারওয়ান মেয়েটি এবং তার পিতাকে ডেকে পাঠাল। মেয়ে এবং মেয়ের পিতা দরবারে উপস্থিত হল। মেয়েটি মারওয়ানের দৃষ্টিতে এতই পছন্দ হল যে, সে মেয়ের পিতাকে রাজি খুশী করে কিছু ধন-দৌলত দিয়ে স্বামী থেকে তালাক নিয়ে ইদ্দতের পর মেয়েকে বিবাহ করে নিল। স্বামী বেচারা স্ত্রীর দিওয়ানা ছিল। সে ন্যায় বিচারের জন্য প্রধান বিচারকের নিকট গেল। বিচারক মেয়েকে এবং মারওয়ানকে ডেকে পাঠাল এবং মারওয়ানকে খুব তিরস্কার ও গালমন্দ করল। মারওয়ান বিচারকের দরবারে উপস্থিত হয়ে স্বীয় দুর্বলতা প্রকাশ করে বলল, মেয়েটি এতই সুন্দরী ছিল যে, তার রূপের ঝলকে আমি তার প্রতি দুর্বল হতে বাধ্য হয়ে গিয়েছিলাম। বিচারক মেয়েটির পূর্বের স্বামীর সম্মুখে মেয়েটিকে উপস্থিত করে বিচারকার্য পরিচালনা করতে মনস্থ করল। মেয়েটি বিচারকের দরবারে উপস্থিত হল। প্রথম দর্শনেই বিচারকও মারওয়ানের মতই কুপোকাত হয়ে গেল। মেয়েটির রূপ-লাবণ্যে হতচোকিত ও বিমোহিত হয়ে বিচারক তাকে বিবাহ কারার নিমিত্ত দিওয়ানা হয়ে গেল। মেয়েটিকে বিবাহ করার জন্য তার সম্মতি আদায়ের লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল। বিচারক সর্ব প্রথম তার স্বামীকে প্রশ্ন করল, আমি যদি তাকে বিবাহ করি, তাহলে তোমার কোন আপত্তি আছে কি? স্বামী সরাসরি বিবাহে সম্মতি জানাতে অস্বীকার করল এবং দু'টি ছন্দে খেদমতগুজার প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রেম-ভালবাসার স্মৃতি উল্লেখ করে বলল, "শপথ মহান সৃষ্টিকর্তার! শপথ মহান সৃষ্টিকর্তার! আমি এর (স্ত্রীর) প্রেম-ভালবাসার স্মৃতি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হতে পারব না কবরের গভীরে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এবং আমার দেহাবয়ব মৃত্তিকায় পরিণত না হওয়া

পর্যন্ত। প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর বিচ্ছেদ ব্যথায় আমি কিরূপে নিজেকে দেব শান্তনা, অথচ আমার অন্তরে রয়েছে গচ্ছিত তার প্রেমের যন্ত্রণা; আর হৃদয় বীণায় বাজে সদা এর বিরহের মূর্চ্ছণা। আমি এখন ভিক্ষা চাই কেবল মহান প্রভুর করুণা। যদি আমি এ স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিও, কিন্তু এর অকৃত্রিম মুহাব্বত ও আনুগত্যের শুকরিয়া ও কাফফারা এ জীবদ্দশায় আদায় করতে পারব না; বরং আমি এর মায়ামাখা আদর-সোহাগ ও অনুগ্রহের অবমূল্যায়নকারীদের অন্তর্ভূক্ত হব।

অতঃপর বিচারক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যাপারে তোমার কি মতামত? বিচারক বলল ঃ তুমি কি আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাও? বিনিময়ে তুমি পাবে ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা, বিশাল সুরম্য অট্টালিকা, মনোরম শয়নকক্ষ, পুষ্পেভরা কানন, ফলে ভরা বাগান, শিশিরস্নাত দুব্বাঘাস, অবয়ব শীতলকারীনী নির্ঝরণী। আর পাবে সোনা-গহণা সহ অঢেল ধন-সম্পদ।

না-কি তুমি মারওয়ানের নিকট যেতে চাও? যে ব্যক্তি তোমার পিতার সাথে সুগভীর চক্রান্তের মাধ্যমে তোমার পূর্বের স্বামীর উপর জুলুম করেছে।

না-কি সেই পূর্বের গ্রাম্য স্বামীর নিকট যেতে চাও? দুঃখ-কষ্ট, দৈন্যদশা, দারিদ্রতা, অনাহারে, অর্ধাহারে যার কুড়ে ঘরে তোমাকে কালাতিপাত করতে হয়েছে। পুনরায় এরই নিকট ফিরে যাবে, না অন্য কারো নিকট?

বিচারকের প্রশ্নের উত্তর মেয়েটি আরবী ভাষায় দিয়েছে। আফসোস! আজ আমাদের মা-বোনেরা যদি আরবী ভাষা বুঝত, তাহলে কতইনা ভালই হত। কারণ, আরবী ভাষার যে মাধুর্য এবং মেয়েটি যে আবেগ নিয়ে উত্তর দিয়েছে, অনুবাদে সে আবেগ ফুটিয়ে তোলা যায় না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মা-বোনদের আরবী ভাষা বোঝার তাউফিক দান করুন। মেয়েটি যে উত্তর দিয়েছে, তার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ব হল। সে বলল, "আমি আমার প্রাণাধিক্য গ্রাম্য স্বামীকে স্বীয় জীবনাপেক্ষা অধিক ভালবাসি। আমি শুধু তাকেই চাই। যদিওবা সে দরিদ্র, নিস্ব এবং কুঁড়ে ঘরে বসবাস করে। কিন্তু সে আমাকে এত আদর-সোহাগ ও ভালবাসা দিয়েছে এবং এমন অমায়িক ব্যবহার উপহার দিয়েছে যে, আমার দৃষ্টিতে আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, সখী-বান্ধবীর তুলনায় সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তিত্ব এই গ্রাম্য

লোকটি। রইল বিচারক এবং মারওয়ানের কথা। তাদের কেউ হয়ত স্বর্ণ দিয়ে ভরে দেবে আর কেউ হয়ত রৌপ্য দিয়ে ভরে দেবে। কিন্তু এই গ্রাম্য লোকটির নিকট থেকে যে প্রেম-ভালবাসা, আদর-সোহাগ, মায়া-মমতা পেয়েছি এবং সে সাহায্য-সহযোগিতা, সহানুভূতি-সহমর্মিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, শান্তনা, সহ্য-ধৈর্য্য এবং স্ত্রীর মনোরঞ্জনের যে অনুপম দৃষ্টান্ত সে স্থাপন করেছে, তা অন্য কারো দ্বারা অসম্ভব প্রায়। আপনি যদি আমাকে পূর্বের স্বামীর নিকট ফিরিয়ে দেন, তাহলে এটা আপনার অনুগ্রহ।"

প্রিয় পাঠক/পাঠিকাবৃন্দ! সুন্দরী মেয়েটির আবেগমাখা উত্তরটি হয়ত আপনাদের ভাল লেগেছে। আরবী ভাষা বুঝলে নিঃসন্দেহে আরো আরো বেশী বেশী ভাল লাগত। আল্লাহ তা'আলা যেন প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমন মুহাব্বত, এমন উলফত দান করেন এবং একে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গকারী, একে অপরের জন্য শুভানুদ্ধায়ী, একে অপরকে ধর্মীয় কর্মে উৎসাহদানকারী বানিয়ে দেন।- আমীন।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

স্বামীর পছন্দীয় বিষয়গুলো জানা

স্বামীর উপর বিজয় অর্জনের নিমিত্ত স্ত্রীর জন্য আবশ্যক এই যে, নিজের মধ্যে এমন গুণ সৃষ্টি করতে হবে, যা স্বামী পছন্দ করেন। স্বামীকে কোন্ পন্থায় সন্তুষ্ট করা যাবে? কেমন কাজ-কর্মে তিনি সন্তুষ্ট হবেন? কেমন কাজ তার পছন্দনীয়? সেগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামী কেমন খাদ্য পছন্দ করেন? কেমন সাজ-গোছ ভালবাসেন, কেশ পরিচর্যার কোন্ ডিজাইন তার ভাল লাগে, কেমন ফ্যাশন তার প্রিয়, তার মনের চাহিদা কেমন এবং কেমন গুণ তাকে আকৃষ্ট করে, এসব কিছু আদর্শ স্ত্রীর অন্তরে গেঁথে নিতে হবে। স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে সুখী সংসার কল্পনা করা ভুল। "স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ" এ কথা স্ত্রীকে বিস্মৃত হলে চলবে না।

সুপ্রিয় পাঠক/পাঠিকাবৃন্দ!

গ্রন্থটি পাঠ করার সময় মুদ্রণগত বা ভুল বশতঃ কোন প্রকার ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে, অবগত করানোর জন্য অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ!– গ্রন্থকার।

এসব নীতিমালাকে হৃদয়ে জমিয়ে সে অনুযায়ী স্বামীর সাথে জীবন যাপন করবে। তাহলে মনে হবে-এই ভবে তার মত সুখী কেউ নেই।

স্বামী সুখী তখনই হবে, যখন স্ত্রী তাঁর জীবন পথের পছন্দীয় সফরসঙ্গীনী গণ্য হবে এবং সর্বদা মনে-প্রাণে তাকেই ভাববে, কামনা করবে। জ্ঞানে-গুণেই স্ত্রী স্বামীকে দেওয়ানা বানাতে পারে। অনেক পুরুষকে তার সুন্দরী স্ত্রী ঘরে রেখে প্রতিবেশীর মহিলাদের সাথে আড্ডা জমাতে দেখা গেছে। এর হেতু কি? স্বামীকে উচ্চ শিক্ষা, ধন-দৌলত, গাড়ী-বাড়ি আর নয়ন ঝলকানো রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্যের প্রয়োজন হয়না। প্রয়োজন হয় গুণের। এর সাথে রূপ-লাবণ্য থাকলে তো সোনায় সোহাগা। অনেক পুরুষ ঘরে সুন্দরী বউ থাকতে বন্ধুর স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে। তার চাল-চলন, আচার-আচরণ তার কাছে খুব ভাল লাগে। মূল্যবান পরিচ্ছদ আর দামী অলংকারে অলংকৃত সুন্দরী স্ত্রীও তার নিকট আকর্ষণীয় মনে হয়না। কী এর কারণ? এর কারণ হল, স্ত্রীর কর্তব্য পালনে অবহেলা এবং স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা। স্বামীকে কিভাবে করায়ত্ব করা যায়, তার হৃদয়কে কি দিয়ে মানানো যায়, এর ত্বরীকা-পদ্ধতি ও দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে অনেক মেয়েরা-বধূরা অনবগত। তাই স্বামীর হৃদয় জয় করার নিয়ম-পদ্ধতিসমূহ অবগত হওয়া প্রতিটি স্ত্রীর জন্য আবশ্যক।

কেমন জিনিষ স্বামীর পছন্দনীয় এবং কেমন গুণের দ্বারা স্বামীর অন্তর জয় করা যায়, তার সম্যক জবাব দেয়া বড় মুশকিল। কেননা, প্রত্যেকের চয়েজ ও পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন স্বামী সাজ-গোছ ও রূপচর্চাকে পছন্দ করে, কেউ সাদা-মোটা জীবন পছন্দ করে, কেউ ফ্যাশন পছন্দ করে, কেউ সরলতা ভালবাসে, কারো নিকট লজ্জাবতী, শরমিলী মেয়ে বড় প্রিয়, কারো নিকট অধিকভাষীণী, কারো নিকট ভোলা-ভালা, সাদা-সিধে চেহারা ভাল লাগে, কারো নিকট টানাটানা পটল চেরা চোখ আর বাঁশীর মত খাড়া খাড়া নাক ভাল লাগে, কেউ নীরব ও ঠান্ডা মেয়ে পছন্দ করে, কেউ চালাক-চতুর ও চঞ্চল মেয়ে পছন্দ করে। মোটকথা, প্রত্যেক নারী-পুরুষের মন-মানসিকতা, চাহিদা, কামনা-বাসনা, পছন্দশক্তি ও নীতি আলাদা আলাদা, ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রতিটি স্ত্রীর স্বীয় স্বামীর মন-মেজাজ ও চাহিদা জেনে নিজের মধ্যে সে ধরনের গুণ ও সৌন্দর্য অর্জন করতে সচেষ্ট হবে। যাতে তার প্রতি স্বামী আকৃষ্ট ও দিওয়ানা হয়ে যায়।

উল্লেখিত বিশেষ গুণাবলী ছাড়াও কতিপয় গুণ এমন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি প্রতিটি স্বামীর সাধারণতঃ আকর্ষণ থাকে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

(১) সর্ব প্রথম গুণ, যার প্রতি আকর্ষণ সকলের থাকে, তা হল রূপ লাবণ্য। তবে স্ত্রী খুব সুন্দরী হতে হবে এটা আবশ্যক নয়। বরং স্ত্রীর সাজ-সজ্জা, রূপচর্চা ও বস্ত্র পরিধানের পদ্ধতি এমন পরিচ্ছন্ন ও চয়েজফুল হওয়া চাই, যদ্দারা তার শরীর স্বামীর নিকট সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

(২) দ্বিতীয় গুণ, অন্তরের পবিত্রতা ও মনের নিষ্কলূষতা। কারণ, হিংসুক, মিথ্যুক ও সংকীর্ণমনা স্ত্রীর উপর প্রত্যেক স্বামীই অসন্তুষ্ট থাকে। সুতরাং অন্তরের পবিত্রতা ও মনের পরিচ্ছন্নতাকে সহজাত স্বভাবে পরিণত করা স্ত্রীর আবশ্যক। এতে তার মধ্যে সৌন্দর্য ও হায়া-শরম দুটো গুণই সৃষ্টি হবে। অহংকারী, হিংসুক ও অপবিত্র মনের মহিলারা স্বামীর নিকট আস্থাভাজন হতে পারে না। এতটুকু নয়, বরং অন্য লোকরোও এমন মহিলাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেনা।

(৩) প্রত্যেক স্বামী এটাই কামনা করে যে, তার স্ত্রী যেন তার থেকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষা-দীক্ষায় কম থাকে। চালাকী ও চতুরতায় স্ত্রী তার স্বামীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করুক এটা কোন বুদ্ধিমান ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন পুরুষ পছন্দ করে না। সামান্য শিক্ষিত একজন পুরুষ কখনো একজন ডিগ্রীধারী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলাকে বিবাহ করে সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে সুখী হতে পারে না। কারণ, এতে স্বামী নিজের দুর্বলতা ও অপমান উপলব্ধি করে। তাই স্ত্রী যদি জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষা-দীক্ষায় স্বামীর তুলনায় বশীও হয়, তবুও স্ত্রী কখনো স্বামীর সম্মুখে নিজের বড়ত্ব, চালাকী, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শিক্ষা-দীক্ষার অহংকার প্রদর্শন করবে না। এতে স্বামীর মন ভেঙ্গে যাবে। স্ত্রী কখনো স্বামীর জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষাগত দুর্বলতার কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না। বরং স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবে। এটাই নারীর কর্তব্য।

বস্তুতঃ নারীরা নিজের তুলনায় জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান ও বীর-বাহাদুর স্বামীকে পছন্দ করে। কিন্তু কোন ক্রমে স্ত্রীর ভাগ্যে নিজের চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে কম স্বামী জুটলে, তাকে অবজ্ঞা ও হেয় করবে না। বরং কথাবার্তা ও আচার-আচরণে তাকেই বড় করে রাখবে।

(৪) স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্টকারী সবচে’ কার্যকরী গুণ ও সৌন্দর্য হল, স্বামীর মূল্যবোধ অন্তরে স্থাপন পূর্বক স্বামীর সেবা ও আদেশের দাসত্ব করা, স্বামীর হুকুমের সম্মুখে মাথা নত করা। এটি নারীর একটি মহৎ গুণ। এর মাধ্যমে স্বামীর মুহাব্বত দ্বিগুণ হয়, আর স্ত্রী নিশ্চিত স্বামীর সোহাগে ধন্য হয়ে কালাতিপাত করতে পারে।

মুখপোড়া, লজ্জাহীনা, জেদী ও নাফরমান নারীদের কোন পুরুষই পছন্দ করে না। ফরমাবরদার নারীরা সহজেই স্বামীর অন্তর জয় করতে সক্ষম হয়।

(৫) স্বামী এমন স্ত্রীকে মনে প্রাণে ভালবাসে, যে তার ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। স্বামীর দোষ থাকা সত্ত্বেও তাকে ভালবাসা স্ত্রীর কর্তব্য। প্রয়োজনে সময় মত হিকমতের সাথে স্বামীকে বুঝিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু দুর্ব্যবহার দ্বারা কিছুতেই স্বভাব পালটান যাবে না। যার আচরণে, ব্যবহারে ও প্রেম-ভালবাসায় অকৃত্রিমতা এবং কথা-বার্তায় মাধুর্যতা ঝরে ঝরে পড়ে, এমন নারীদের পুরুষরা আন্তরিকভাবে কামনা করে।

(৬) পুরুষরা এমন নারীদের পছন্দ করে- যারা মায়াবী, বিনয়ী, অন্যের দুঃখে দুঃখীনী, অপরের কষ্টে যার অন্তরে সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়, ইয়াতীম অসহায় শিশুদের দেখলে কোলে তুলে নেয়, যার হৃদয় মানবতা, মনুষ্যতা ও সমাজ সেবার মানসিকতা দ্বারা পরিপূর্ণ, এমন স্ত্রীকে স্বামী মনে-প্রাণে খুব পছন্দ করে। কিন্তু নেতৃত্বকামিনী, কর্কশভাষী, বদজবান মহিলা সবসময় উদাস ও নিরাশ হয়ে খামুশ চুপচাপ বসে থাকে, এমন মহিলাকে কোন পুরুষই পছন্দ করে না।

(৭) স্ত্রীর মনহরণী চাহিনী আর মুচকী হাসির ঝলক স্বামীর জন্য আনন্দদায়ক। যে রমণী নিজে সদা-সর্বদা হাসি-খুশি থাকে, সে অন্যকেও হাসি-খুশি রাখতে পারে। স্ত্রীর এ গুণটি স্বামীর চিন্তা-ফিকির, ক্লান্তি ও পেরেশনীকে দূর করে তাকে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, শক্তি-সাহস ও মনের সজীবতা দান করে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন স্বামীকে আনন্দপূর্ণ ও হাস্যময়ী চেহারা দ্বারা প্রশান্তি উপহার দেয়ার ব্যাপারে গুণবতী স্ত্রীকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

স্বামী যে কথায় আনন্দ পায়, এমন কথাই বলা স্ত্রীর জন্য বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীর হাসিমাখা, আনন্দভরা মুখাবয়ব স্বামীর অসংখ্য দুঃখ-বেদনা দূর করতে পারে। “তুমি হাসিলে জগত হাসে” স্বামীর মনের এ অমূল্য বাক্যটি স্ত্রীকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে।

(৮) নারীর সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ গুণটি হল, তার সতীত্বের সংরক্ষণ। সতীত্বের নূরে নারীর সৌন্দর্য নূরান্বিত হয়ে উঠে। যে নারীর মনের মধ্যে সতীত্বের মূল্যবোধ সদা জাগ্রত থাকে, সে তার প্রানপ্রিয় স্বামীর অনুগত-বাধ্যগত থাকে এবং সে নারী সতীত্বের রোশনীতে চমকাতে থাকে। সতীত্বের নূর ও সৌন্দর্য দেহের সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। যে নারীর ভেতর এ মহৎগুণটি অনুপস্থিত, সে দেহ-যৌবনের দিক দিয়ে যতই সুন্দরী-রূপসী হোক না কেন, স্বামী ও সমাজের নিকট তার মূল্যে এক কানাকড়িও নয়।

সতীত্বের নূরে নারী স্বামীর মন জয় করতে পারে, দাম্পত্য জীবনে সুখ আনতে পারে। সতীত্বের নূর দ্বারা একজন সতী-সাধ্বী নারী স্বীয় গরীব গৃহকেও জান্নাতের নমুনারূপে উপস্থাপন করতে পারে, স্বামীর সাথে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। নারীর সতীত্বের নিদর্শনের বড় অংশ হল, তার পর্দা রক্ষা করা। শরয়ী পর্দা পূর্ণরূপে পালনের মাধ্যমে নারী বেগানা পুরুষদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে হিফাজত করে স্বামীর জন্য নিজেকে সর্বান্তকরণে নিবেদিত করবে। নামায, রোযা, প্রভৃতি ইবাদত-বন্দেগী ও যাবতীয় গুনাহ থেকে পরহেজগারী অর্জনও নারীর সতীত্বের অমূল্য নিদর্শন।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ দুটি গুণ

এ শিরোনামে হযরত মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দ শহরী (রাঃ) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেছেন। লক্ষ্য করুন ঃ

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ যে সমস্ত নারীগণ উটে আরোহন করেছে (আরবী নারীগণ) তাদের মধ্যে উত্তম নারী হল কুরাইশ নারী, যারা সন্তানের প্রতি শিশুকাল থেকেই সর্বাপেক্ষা স্নেহময়ী, মায়াময়ী হয় এবং স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষায় সবচে’ বেশী সজাগ দৃষ্টি রাখে। -বুখারী ও মুসলিম শরীফ

উল্লেখিত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যা ঃ আরব দেশে নারী-পুরুষ প্রায় সকলেই উটে আরোহন করে। এ জন্য আরবী নারীদের আলোচনায় হুজুর (সাঃ) উটের উপর আরোহনের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখিত হাদীসে নারীদের প্রশংসারযোগ্য দু'টি কথা উল্লেখ করেছেন। (সন্তানদের আদর-সোহাগ দিয়ে লালন-পালন করা (২) স্বামীর ধন-সম্পত্তি সংরক্ষণ করা। এ দুটো স্বভাব ও গুণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যক। যদিও স্বীয় সন্তানকে আদর-সোহাগ দ্বারা প্রতিপালন করা প্রতিটি নারীর জনমগত ও সহজাত স্বভাব, তথাপি প্রিয় নবীজী (সাঃ) এ কাজের প্রশংসা করে এটাকেও দ্বীনদারীর অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

স্বামীর মাল সংরক্ষণ করাও ঈমানের দাবী। উল্লেখিত হাদীস শরীফে কুরাইশ নারীদের একটি কাজের প্রশংসা এও করা হয়েছে যে, তারা অন্যান্য নারীদের তুলনায় স্বামীর ধন-সম্পত্তির খুব বেশী হেফাযত করে। বলাই বাহুল্য, স্বামীর মাল-দৌলত সংরক্ষণ করা, প্রয়োজন মুতাবিক ব্যয় বরা, নিয়ম মাফিক, বুঝে শুনে, সুষ্ট ব্যবস্থাপনায় সংসার পরিচালনা করাও দ্বীনদারীর অন্তর্ভূক্ত। স্বামীর কাজ হল টাকা-পয়সা উপার্জণ করা এবং বাড়িতে নিয়ে আসা। সে সর্বদা ঘরে বসে থাকতে পারেনা। .... বাধ্য হয়েই স্ত্রীর দায়িত্বে অর্পণ করতে হয়। এখন স্ত্রীর দ্বীনদারী ও সমঝদারী এই যে, সংসার পরিচালনায় স্বামীর সহযোগিতা করা এরং আমানতদারী ও দিয়ানতদারীর সাথে নিজের উপর, স্বামীর উপর, সন্তানদের উপর এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর উপর ব্যয় করা।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

শ্বাশুড়ী আম্মার খেদমত করা

প্রতিটি স্ত্রীর জন্য শ্বাশুড়ী একটি অমূল্য নিয়ামত। দেবর, ভাশুর থাকা সত্ত্বেও যে বধূ প্রাণপ্রিয় পতির দুঃখিনী মায়ের অর্থাৎ শ্বাশুড়ীর খেদমত করার সুযোগ পায়, সে বড় কিসমতওয়ালী, ভাগ্যবতী।

বস্তুত ঃ শ্বাশুড়ীর সহিত সদ্ব্যবহার করা, তাঁর খিদমত করা এবং যৌথ পরিবার হলে, তাঁর নির্দেশনা মত সংসার পরিচালনা করা আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। শ্বাশুড়ীকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে তার সাথে আড়া আড়ির আচরণ করা বধূর জন্য কখনও উচিত নয়। শাশুড়ী সম্পর্কে বধূকে গভীরভাব

চিন্তা করতে হবে যে, শাশুড়ী যদি তার শত্রু হতেন, তাহলে তাকে কখনো পুত্রবধূরূপে নির্বাচিত করতেন না এবং তাকে নিজ পুত্রের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিজ বাড়িতে তুলতেন না। নববধূর স্মরণ রাখা দরকার যে, সকল শাশুড়ী খারাপ ও ঝগড়াটে হন না। অনেক পরিবারে এটাই পরিলক্ষিত হয় যে, বৌমা-ই নিজ নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা হেতু সংসারের সম্পূর্ণ কাঠামো বিনষ্ট করে দেয় এবং মাতা-পুত্রের মায়া জড়ানো সুসম্পর্কের পথে কাঁটা ছিটিয়ে দেয়। অনেক পুত্রবধূ অত্যন্ত হিংসুক ও ঝগড়াটে হয়ে থাকে। যদ্দরুন শাশুড়ীকে দুঃখ-কষ্ট দেয় ও জ্বালাতন করে। বিশেষ করে যখন শাশুড়ী বেচারী পুত্র ও পুত্রবধূর মুখাপেক্ষী হন, তখন অনেক বধূ বে-লেগাম ও বে-পরওয়া হয়ে যায়। তারা শাশুড়ীকে কথায় কথায় খোঁটা দেয়এবং বিভিন্ন পন্থায় জ্বালাতন করে। যে শাশুড়ী একদিন গৃহের রাণী ছিলেন, নিজ পরিবারে রাজত্ব করতেন, বাধা দেয়ার কেউ ছিলনা, তিনি বৃদ্ধা বয়সে পুত্রবধূর দাপটের সম্মুখে অসহায় হয়ে যান। সকল ক্ষমতা তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। পুত্রবধূ নিজ ইচ্ছানুযায়ী স্বেচ্ছাচারিণীর মত রাজত্ব পরিচালনা করতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহানায় শাশুড়ীর সাথে ঝগড়া করে এবং তাকে কষ্ট দেয়। অসুস্থ শাশুড়ীর খোঁজ-খবর পর্যন্ত নেয় না। কেমন যেন এ গৃহে ঐ বৃদ্ধা মহিলার কোন অধিকার নেই। এটা বধূর বড়ই অনাকাংখিত অন্যায় আচরণ।

আমাদের সমাজে অনেক বধূ এমনও রয়েছে, যারা শাশুড়ী দ্বারা আযাচিত সেবা গ্রহণ করে থাকে। যেমন, বাথরুমে রেখে আসা বৌমার ভিজে শাড়ী, ব্লাউজ, পেটিকোট ইত্যাদি, নাতী-পুতীদের মল-মুত্রের কাঁথা ধোয়ানো প্রভৃতি। শাশুড়ীরও পেটের দায়ে বাধ্য হন এসব করতে। তখন মনের দুঃখে চোখের অশ্রুতে বুক ভাসান এবং স্বেচ্ছাচারিণী বৌকে বদ-দু'আ করেন।

কোন কোন বৌয়ের মধ্যে এ বদঅভ্যাস পরিলক্ষিত হয় যে, সে সাংসারিক ব্যাপারে সামান্য সামান্য কথাকে বাড়িয়ে তিলকে তাল করে সাজিয়ে স্বামীর নিকট শাশুড়ী ও ননদের বিরুদ্ধে নালিশ করে থাকে। ইনিয়ে বিনিয়ে মায়া কান্না কেঁদে শাশুড়ী ও ননদের বিরুদ্ধে স্বামীকে উত্তেজিত করতে থাকে। স্বামী বেচারা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকেন, বিধায় চালবাজ স্ত্রীর প্রতারণার শিকার হন। যদ্দরুন স্বীয় মা-বোনদের সাথে ঝঞ্ঝাটে জড়িত হয়ে পড়েন। এমনকি মা, ভাই-বোনদের সঙ্গে ঝগড়া

বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তখন ডাইনী পুত্রবধূ পাশের কক্ষ থেকে তামাশা দেখতে থাকে। স্মরণ রাখতে হবে, এমন বৌ যারা শাশুড়ীদের উপর জুলুম করে, তারা এ পৃথিবীতেই তার শাস্তি ভোগ করবে, অথবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হবে।

বধূকে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এ বাড়িতে যদিও সে দাসী বা চাকরাণী নয়, কিন্তু স্বামীর সেবা-যত্ন করা এটা আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর ফরজ করেছেন। ইনসাফের দৃষ্টিতে পুত্রের জন্য মায়ের চেয়ে পৃথিবীতে অন্য কেউ সম্মানিত নয়। মা জননী অসংখ্য দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে তাকে লালন-পালন করছেন। এখন সেই আদরের পুত্র বৌমার স্বামী। তার স্বামীর জান্নাত যার পদতলে, তিনি হলেন তাঁর বৃদ্ধা মা। যার সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।"

পুত্র যদি বে-আকল, বুদ্ধিহীন স্ত্রীর ক্ষপ্পরে পড়ে অথবা উস্কানীতে উত্তেজিত হয়ে অযাচিত কিছু করে ফেলে এবং ছলনাময়ী রঙ্গীলী স্ত্রীর মুহাব্বতে অন্ধ হয়ে স্নেহময়ী মা জননীর সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার পরিণতি বড় করুন হবে, এটা বৌয়ের মনে রাখা দরকার। বৌয়ের লক্ষ্য রাখা দরকার যে, তার স্বামীর জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে। তাই সেই মায়ের মনে কষ্ট দেয়ার কারণে স্বামীর জান্নাত যাতে নষ্ট না হয়ে যায়। উপরন্তু, স্ত্রী যদি নিজ স্বামীর খিদমতের পাশাপাশি শাশুড়ীর খিদমত করতে পারে, তাহলে এটা তার খোশ কিসমত। কারণ, এর দ্বারা মা স্বীয় ছেলে ও বধূর উপর সন্তুষ্ট থাকবেন, যা হবে তাদের পরকালে সাফল্য লাভের সহায়ক। বধূর স্মরণ রাখতে হবে, শাশুড়ী যতটুকু হায়াত পেয়েছেন, আর হয়ত এতটুকু হায়াত পাবেন বা তার কম। শাশুড়ীর পরেই সে এ বাড়ির কর্তী হবে, গৃহের একচ্ছত্র রাজত্বের অধিকারী হবে। ক্ষমতার বলগা তার হস্তে অর্পিত হবে। তার জন্য এত তাড়াহুড়ো করার ফায়েদা কি? যদি শাশুড়ী বধূর কোন আচরণে কুধারণা করে বা অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে তা থেকে বিরত থাকা উচিত? প্রশস্ত হৃদয়ে শাশুড়ীর কথা সহ্য করে যেতে হবে। কেননা, ক'দিন পর তাকেও তো শাশুড়ীর আসন গ্রহণ করতে হবে।

পুত্রবধূকে স্মরণ রাখতে হবে যে, শাশুড়ী নিজ গৃহের কর্ত্রী ও রাণী। তিনি মজ্জাগতভাবে এটাই কামনা করেন যে, সংসারের বড়-ছোট সকলেই তার কথা মত চলুক, তার আদেশ পালন করুক, তার সম্মান করুক,

তাকে বড় মনে করে সকল কাজ তার পরামর্শ অনুযায়ী করুক। বৌমা কথা মনেব না এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, এটা কোন শাশুড়ীই বরদাশত করবেন না। এমনিভাবে বৌমার দুর্ব্যবহার, কর্কষ ভাষা, বদমেজাজী, তিক্তস্বভাব ও বাচালিপনা শাশুড়ীদের সহ্য হয় না। তাই আদর্শ স্ত্রীর জন্য আবশ্যক যে, সর্বাবস্থায় শাশুড়ীর মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা, তার আদব-লেহাজ বজায় রাখা।

শাশুড়ীকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তার পুত্রবধূ দাসীরূপে তার গৃহে পদার্পণ করেনি যে, স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাব নিয়ে তাকে দিয়েই সব কাজ করিয়ে নিতে হবে। শাশুড়ী নিজেই তো তাকে বাছাই করে স্বীয় পুত্রের স্ত্রীরূপে ঘরে তুলেছেন। কাজেই তাকে উত্তমরূপে বরণ করে নিয়ে তার দোষ-ত্রুটির তুলনায় তার গুণের প্রতি বেশী নজর রাখা দরকার।

আফসোস, আজ যদি মুসলিম নারীগণ ইসলামী শিক্ষা অর্জন করত এবং দ্বীনের উপর আমলের তরবিয়্যত লাভ করত, তাহলে আমাদের সমাজে হয়ত শাশুড়ী-বৌদের এমন নাপাক ঝগড়া সৃষ্টি হত না। ইসলামী শিক্ষা অর্জন করলে মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ, ভুল-সঠিকের মধ্যে পার্থক্য করার গুণ সৃষ্টি হয়। তখন শাশুড়ী বৌমাকে কষ্ট দিত না এবং বৌমাও শাশুড়ীরে বিরক্ত করত না।

আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য এই যে, সে শাশুড়ীকে আপন মায়ের মত মনে করবে, তার আনুগত্য করবে, তার ইজ্জত ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বরং মায়ের চেয়েও শাশুড়ীকে অধিক সম্মান করবে। কারণ, মা তো নিজের মা, আর শাশুড়ী তো প্রাণপ্রিয় স্বামীর মা। মেয়েরা নিজের মায়ের নিকট থাকে জীবনের প্রারম্ভিক কিছুকাল। বাকী জীবনই তো স্বামীর বাড়ীতে কাটাতে হয়। তাই প্রাণ খুলে শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ীর খিদমত করতে হবে। শাশুড়ীর খিদমত দ্বারা যে দু'আ প্রাপ্ত হবে, তার ভবিষ্যত জীবনের জন্য তা পাথেয় হয়ে থাকবে এবং অসংখ্য বালা-মুসীবত ও আপদ-বিপদ থেকে উদ্ধারের উসীলা হয়ে যাবে। শাশুড়ীর দু'আ তার সন্তানের প্রত্যেক মুসীবতের জন্য সুদৃঢ় দুর্গের ভূমিকা রাখবে। শাশুড়ীর আন্তরিক দু'আ পুত্রবধূর জন্য মূল্যবান আশ্রয়। প্রচন্ড শীতের রাত্রের দ্বিপ্রহরে অসুস্থ শাশুড়ীর শিয়রে বসে তার খিদমত করা এমন মহা দৌলত, যার মূল্য এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পরই বুঝে আসবে।

জেদী শাশুড়ী-যিনি লম্পট দেবরের কথা, ফাসাদী ননদের কথা, এমনকি ঝগড়াটে জায়ের প্রতিটি কথা, প্রতিটি অভিযোগে সত্য মনে করেন, এমন শাশুড়ীর সাথেও নববধূকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত সুব্যবহার করতে হবে। তার গীবত না করা, তাহাজ্জুদ নামায পড়ে তার জন্য দু'আ করা, ভুল না হওয়া সত্ত্বেও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা বধূর অতি উত্তম গুণ। যে নারী এমন গুণের আধার, তাদের কোলেই আল্লাহ তা'আলা রাবেয়া বসরী (রঃ) অথবা হযরত থানভী (রঃ)-এর মত মনীষীগণকে দান করেন। যাঁদের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের ধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ লোক গোমরাহী ও ভ্রান্ত পথ থেকে নাজাত পেয়ে সুপথের দিশা পায়।

আদর্শ স্ত্রীর জন্য এ বিষয়টি লক্ষণীয় যে, পিত্রালয়ে যেয়ে কখনো শ্বশুরালয়ের দুর্নাম-বদনাম করবে না। আর যেমনিভাবে পিত্রালয়ে নিজ গুণের বাহারে সকলের দৃষ্টেতে প্রিয় পাত্র ছিলে, তেমনিভাবে শ্বশুরালয়েও কাজ-কর্মের গুণ দ্বারা সকলের প্রিয় পাত্র হওয়ার চেষ্টা করবে। মনে রাখতে হবে, আসল প্রশংসার পাত্র ঐ বধূ, যার প্রশংসা পিত্রালয়ে-শ্বশুরালয়ে উভয় স্থানে সকলে করে। যদি বধূ উপরোল্লেখিত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী শাশুড়ীর সাথে শ্রদ্ধাভরা আচরণ করে জীবন যাপন করতে পারে, তাহলে শাশুড়ী যতই রাগী, জেদী, কর্কষভাষীণী, ঝগড়াটে হোন না কেন, পুত্রবধূর সাথে লড়াই করার হিম্মত করবেন না। তিনি মনে করবেন যে, এমন বোবা, বধির বৌ-এর সাথে ঝগড়া করে কোন প্রকার তৃপ্তি পাওয়া যাবে না। সকল কথা হেসে উড়িয়ে দেয় যে বউ, তার সাথে লড়াই করে কি লাভ? মনের দুঃখে হোক, সুখে হোক, বৌ-এর সাথে ঝগড়া করা থেকে নিবৃত্ত হতে তিনি বাধ্য হবেন।

পাশাপাশি শাশুড়ীর কর্তব্য এই যে, তিনি পুত্রবধূর সাথে খুব নম্র ব্যবহার করবেন এবং আপন মেয়ের মত ভেবে সন্তান বাৎসল্য আচরণ করবেন। দয়া ও রহমমাখা ব্যবহার করবেন। আর বৌমা সম্পর্কে এমন মনে করবেন যে, এ তো পরের ঘরের অনভিজ্ঞ, অবুঝ মেয়ে। আপন মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে পরিত্যাগ করে এসেছে। সে তো এখন আমার বাড়ির মেহমান। আমরা ব্যতীত তার আপন কে-ই বা আছে এখানে? এখন যদি আমারা তার সাথে দুর্ব্যবহার

করি, অশালীন আচরণ করি, তাহলে হতভাগা বেচারী কোথায় যাবে? তাকে শান্ত্বনা কে দেবে?

যদি শাশুড়ী উল্লেখিত পরামর্শ অনুযায়ী আমল করেন, তাহলে পুত্রবধূ যতই ফেৎনাবাজ, তুফানমেজাজী হোক না কেন, শাশুড়ীকে আপন মায়ের মত মনে করে কালাতিপাত করতে বাধ্য হবে। তখন প্রশান্তি আর সুখ বিরাজ করবে সংসারে, গৃহের প্রতিটি সদস্যর হৃদয় গভীরে।

প্রাণ প্রিয় স্বামীর সাথে সম্পর্ক গভীরতর করা যেমনিভাবে বুদ্ধিমতি স্ত্রীর কর্তব্য, তেমনিভাবে স্বামীর স্নেহময়ী মা জননী অর্থাৎ শাশুড়ীর সাথেও সম্পর্ক গভীর করা আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। সু-সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে হৃদ্যতাপূর্ণ মন-মানসিকতা সৃষ্টি না করতে পারলে এর বিপরীতটা অবশ্যই হবে, অর্থাৎ ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ঘটবে। তবে এক তরফাভাবে কস্মিনকালেও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হবে না-যাবৎ না শাশুড়ীও বৌয়ের সাথে সুসম্পর্ক গভীরতর করতে যত্নবান হবেন।

বৌ যদি নিজেকে শ্বশুর বাড়ীর রাজরাণী ভাবে এবং শাশুড়ী কে ভাবে দাসী বা সংসারের গলগ্রহ, তাহলে বৌ-শাশুড়ী ঝগড়া বাঁধা সময়ের ব্যাপার মাত্র। তেমনিভাবে শাশুড়ী মহারাণী যদি নিজেকে সংসারের একমাত্র মহাকর্ত্রী ভাবেন এবং বৌমাকে ভাবেন চাকরাণী বা দাসী, তাহলেও বৌ-শাশুড়ীর বিবাদ বাঁধবে অহরহ। বলতে কি, সমাজে অসংখ্য নিরীহ পুরুষদের কপাল পোড়ে বৌ-শাশুড়ীর এ জাতিয় ঝগড়ার অনলে। স্ত্রীর পক্ষপাতিত্ব করলে মায়ের মুখ দ্বারা বদ-দু'আর বন্যা বয়ে যায়, আর মায়ের পক্ষপাতিত্ব করলে স্ত্রীর নয়ন যুগলে অশ্রুর বন্যা বয়ে যায়। বেচারা না স্ত্রী ছাড়তে পারে, না স্নেহময়ী মাকে ছাড়তে পারে। তার অন্তর দুঃখের দহনে তিলে তিলে ক্ষয় হয়।

কি কি কারণে বৌ-শাশুড়ীর মাঝে ঝগড়া হতে পারে, তা উল্লেখ করছি। এগুলো ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করে এসব থেকে পরহেয করলে আশা করা যায়, বৌ-শাশুড়ীর ঝগড়া তিরোহিত হবে এবং পারিবারিক জীবন সুন্দর ও স্বার্থক হবে।

বৌ-শাশুড়ীর ঝগড়া বাঁধার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তব সম্মত কারণ হলো ঘরে দ্বীনদারী না থাকা। যখন ঘরে দ্বীনদারী আসবে, আল্লাহ তা'আলার আহকাম যিনদা হবে, তখন বৌ-শাশুড়ীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব-ফাসাদ খতম হয়ে যাবে। এছাড়া বৌ-শাশুড়ীর ঝগড়ার আরো

যে সব কারণ রয়েছে, সেগুলো হলো-

১ম কারণ ঃ শাশুড়ীর অন্তরে এমন কুধারণা বদ্ধমূল হয় যে, যে ছেলেকে আমি এ যাবৎ এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে শরীরের রক্ত পানি করে খাওয়ায়ে-দাওয়ায়ে মানুষ করলাম, আজ নতুন একটা মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসে তার উপর রাজত্ব করবে এবং আমার কলিজার টুকরা আমর হাত ছাড়া হয়ে যাবে, এটা কেমনে মেনে নেয়া যায়?

এধরনের ধারণা মনে এলে শাশুড়ীর চিন্তা করা দরকার, এটা আল্লাহ পাকের বিধান ও জগতের নিয়ম যে, পিতা-মাতা সন্তানদের বড় করে গড়ে তুলে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে অপরের হাতে তুলে দেয়। এক্ষেত্রে সে নিজের মেয়ের অবস্থা চিন্তা করবে যে, তাকেও তো বড় করে অপরের হাতে তুলে দিয়েছি এবং সেই জমাইও তো কোন না কোন মায়ের সন্তান। সে আমার মেয়েকেও তো তার কোল জুড়ে বসিয়েছে এবং আমিও চাই যে, আমার মেয়ে সেই সংসারের রাণী হয়ে থকুক। তাই আমার ছেলের ঘরের বৌও তো সে রকমই অধিকার পাওয়ার যোগ্য।

২য় কারণ ঃ শাশুড়ী স্বীয় গৃহের মাহারণী হয়ে থাকেন। গোটা বাড়ীতে তার রাজত্ব পরিচালিত হয়। তিনি আপন শক্তি-সামর্থ, ইখতিয়ার ও ইচ্ছানুযায়ী প্রত্যেক কাজ সমাধা করে থাকেন। এখন বৌ বাড়ীতে অবির্ভূত হওয়ার পর তার মনে এ দুর্বলতা দেখা দেয় যে, বৌমা আমার উপর রাজত্ব পরিচালিত করতে আরম্ভ করবে। আর প্রত্যেক কাজে প্রত্যেক ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করবে। তাতে আমার ক্ষমতা ও রাজত্ব পরিচালনা করার কাজে ব্যাঘাত ঘটবে এবং রাজত্বের পরিধি খাটো হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে শাশুড়ীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনিও একদিন বধূ ছিলেন এবং সংসারের কর্তৃত্ব করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি তো এখন ক্রমশঃই বার্ধক্যে পতিত হবেন, তখন সংসারের দায়িত্বর বোঝা বধূর নিকট গেলে তাতে তো তারই কাজে আসান হল।

৩য় কারণ ঃ শাশুড়ী শুধুমাত্র আপন স্বামীর ধন-সম্পত্তি ও টকা পয়সা, সোনা-গয়নাকে নিজ মালিকানাধীন মনে করে তা-ই নয়, বরং পুত্রের উপার্জিত সম্পত্তির উপরও নিজের দখলদারিত্ব চায়। যখন পুত্রবধূ (আপন স্বামীর) ঐ সম্পত্তি হতে প্রয়োজনে হাত খরচ ইত্যাদি বাবদ কোন অংশ

চায়, তখন শাশুড়ীর তা বরদাসত হয় না; বরং বৌয়ের ঐ চাওয়াকে স্বীয়-দখল-দারিত্বে হস্তক্ষেপ মনে করে ঝগড়া বাঁধায়।

শাশুড়ীর এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, পুত্রের উপার্জিত অর্থ-সম্পদ পুত্রের একান্তই নিজস্ব। স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর সুনির্দিষ্ট হক রয়েছে। রয়েছে দাম্পত্য অধিকার। সে অধিকার শাশুড়ীকে মেনে নিতেই হবে। অবশ্য মা-বাবা মুখাপেক্ষী হলে, তাদের আর্থিক সাহায্য ও খোরপোষের ব্যবস্থা করা ছেলেদের কর্তব্য।

৪র্থ কারণ ঃ যে কোন শাশুড়ীর অন্তরে মাঝে মাঝে এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, মনে হয় বৌ আমাদের বাড়ীর জিনিষপত্র অগোচরে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়।

এমন শাশুড়ীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, শুধু সন্দেহের বশে কারো উপর অপবাদ আরোপ করা ঠিক নয়। তা ছাড়া বৌ যদি সম্পূর্ণ নিজের মালিকানার কিছু মা-বাবা বা ভাই-বোনকে হাদিয়া দেয়, তাতে শাশুড়ীর বলার কিছু নেই।

৫ম কারণ ঃ বৌ যখন নিজের জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ অথবা প্রসাধনী-সামগ্রী ক্রয় করে, তখন শাশুড়ীর মনে শংসয় বাসা বাঁধে যে, আমার ছেলের পকেট থেকে চুরি করা টাকা দ্বারাই হয়ত বৌ এত সব ক্রয় করছে। এছাড়া বৌ কোন কিছু ক্রয় করলেই আড়ির বশে শাশুড়ীর মুখটা মলিন হয়ে যায়।

শাশুড়ীর মরে রাখতে হবে-তিনি যখন বধূ ছিলেন, তখনও এমন প্রসাধনী ব্যবহার করেছেন। আর স্বামীর কর্তব্যও হচ্ছে, স্ত্রীর প্রয়োজনীয় প্রসাধনী যোগান দেয়া এবং এটা স্ত্রীর হক। তাই সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া নিছক ধারণা বশে বৌমাকে অপরাধী বানিয়ে মনোমালিন্যতা সৃষ্টি করা উচিত নয়।

৬ষ্ঠ কারণ ঃ শাশুড়ী নিজের অতীত থেকে অনেক সময় শিক্ষা নিয়ে বৌয়ের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকেন। তিনি স্মরণ করেন যে, তিনিও বৌ ছিলেন এবং তাঁর শাশুড়ী মহারাণী তার সাথে কেমন অমানবিক আচরণ করতেন। কর্কষভাষিণী শাশুড়ীর অমানুষিক আচরণ তখন তার নিকট কেমন অসহনীয়

ও অসহ্য মনে লাগত। এর অনুসৃত পথেই তিনি স্বীয় বৌয়ের সাথে দুর্ব্যবহার করতে শুরু করেন।

এক্ষেত্রে বরং সুশিক্ষা গ্রহণ করা দরকার যে, শাশুড়ী দুর্ব্যবহার করলে, বৌয়ের জন্য তা কতটুকু মর্মব্যথার কারণ হয়। শাশুড়ী অতীত থেকে সুশিক্ষা নিলে অবশ্যই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, তার পুত্রবধূও একজন মানুষ। তার পাঁজরপার্শ্বেও একটা হৃদয় আছে। শাশুড়ীর পক্ষ থেকে সুব্যবহারের প্রত্যাশা সেও ঐকান্তিকভাবে কামনা করে, যেমন তিনি তার শাশুড়ী থেকে কামনা করতেন।

৭ম কারণ ঃ অনেক সময় যখন একবার কোন ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তখন শাশুড়ীর পক্ষ থেকে পুত্রবধূর উপর কুধারণার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যায় এবং নিত্য নতুন ঝগড়া-ফাসাদের ইস্যু জন্ম নেয়। তখন তিলকে তাল বানিয়ে ফেলা হয়। শুরু হয় চরম দ্বন্দ্ব। এভাবে শাশুড়ী-বৌমার সুসম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র সন্দেহের বশে বৌয়ের উপর অপবাদ আরোপ করা ঠিক নয়। হ্যাঁ, যদি প্রকৃতই তার মধ্যে কোন ভুল-ত্রুটি থাকে, তাহলে নিজের মেয়ে হলে যেমনিভাবে তাকে ফেলে দিতে পারতেন না, বরং সংশোধন করতে চেষ্টা করতেন, তেমনিভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাকে শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে।

৮ম কারণ ঃ অনেক শাশুড়ী মজ্জাগতবাবে বদ-মেজাজ ও কর্কষভাষীণী হয়ে থাকেন। হিংসুক ও বদ মেজাজী হওয়ার কারণে না নিজে এক মুহূর্ত শান্ত থাকতে পারেন, না বৌকে শান্তিতে থাকতে দেন। কথায় কথায় তিরস্কার ও ভর্ৎসনার গোলা পুত্রবধূর মুখের উপর মারতে থাকেন। বৌমাও তো রক্ত-গোশতের মানুষ। কাঁহাতক সে খামুশ ভূমিকা পালন করবে? অল্প অল্প মুখকুশায়ী করে জবাব দিতে থাকে। তখন আস্তে আস্তে বৌ-শাশুড়ীর মাঝে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়।

এমন শাশুড়ীদের মেজাজ শুধরানোর জন্য দ্বীনী কিতাবাদি বেশী বেশী পড়া দরকার এবং ইসলামী বয়ান ও তালীম শোনা দরকার। দ্বীনী বুজ আসলে কু-অভ্যাস দূর হয়ে যাবে আশা করি।

নেককার স্ত্রী পৃথিবীর উত্তম সামগ্রী

উল্লেখিত শিরোনামের বিষয়বস্তুর প্রমাণ স্বরূপ হযরত আশেকে ইলাহী বুলন্দ শহরী (রাঃ) মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন-

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, যার অর্থ ঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী বর্ণনা করেন যে, "এ বিশ্বভূমন্ডল পুরোটাই ভোগ সম্ভার ও আনন্দ উল্লাসের সামগ্রী। তন্মধ্যে সর্বোত্তম সামগ্রী হল নেক ও সৎকর্মপরায়ণ নারী।"

হযরত বুলন্দ শহরী উল্লেখিত হাদীসের তাফসীর এরূপ করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ দৃশ্যত ঃ সকল মানুষ হাড়, রক্ত ও গোশতের তৈরী। সাধারণতঃ সকলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই রকম। অবশ্য ঈমান, সচ্চরিত্র ও নেক আমলের কারণে একজন অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে। কৃষ্ণাঙ্গ, শেতাঙ্গ হওয়া, বিশেষ কোন দেশের অধিবাসী হওয়া, মোটা তাজা হওয়া তেমন কোন বৈশিষ্ট্যের কথা নয়। যদি কেউ বর্ণে, সৌন্দয্যে, রূপ-লাবণ্যে আকর্ষণীয় হয়, কিন্তু তার মধ্যে কারো জন্য সামান্য সহানুভূতি, সহমর্মিতা নেই, তাহলে তাকে তার ঐ সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য মনুষ্যত্ত্বের গুণে গুনান্বিত করতে পারেনা। এমনিভাবে কোন মানুষ যদি জাগতিক দিক দিয়ে বড় হয়ে যায়-যেমন অফিসের বড় সাহেব, কিংবা এম,পি, মন্ত্রী-মিনিষ্টার, চেয়ারম্যান, জমীদার হয়ে যায়, কিন্তু চারিত্রিক দিক দিয়ে হিংস্র জীব-জন্তুর মত অথবা কিলার, গডফাদার বা গুন্ডার মত, তাহলে তাকে জাগতিক পদের কারণে পছন্দীয় বা জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব বলা যায় না।

এমনিভাবে যদি কারো নিকট অগাধ সম্পত্তি থাকে, কোটি কোটি ডলার থাকে, কিন্তু সে চরিত্রহীন, লোভী অধিকন্তু কৃপণ। তাহলে শুধুমাত্র ঐ ধন-সম্পত্তির কারণে সমাজে তার কেন শ্রেষ্ঠত্ব বা সতন্ত্র্য মর্যাদা নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ (নারী বা পুরুষ) দ্বীনদার হয় অর্থাৎ উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মহানবী (সাঃ) এর অনুসারী হয়, নবী আদর্শে আদর্শবান হয়, সাহাবা চরিত্রে চরিত্রবান হয়, তাহলে সে মর্যাদাবান আদর্শ মানব এবং মনুষ্যত্বে সুসজ্জিত। সে ভালবাসা ও মানবতার মূর্ত প্রতিক। ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ-মমতার ভাস্কর। পরের সাথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত থাকে। বন্ধু-বান্ধব, সাথী-সঙ্গীদের প্রয়োজন সমাধা করতে অভ্যস্ত। যে কেউ, তার

সাথে মেলা-মেশা উঠা-বসা করে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তার মায়া-মমতা, ভালবাসা সফরের সাথীদের এবং প্রতিবেশীদের মায়াডোরে বেধে নেয়। যদি এমন চরিত্রবান পুরুষের সাথে কোন নারীর বিবাহ হয়, তাহলে ঐ নারী স্বামীর উত্তম চরিত্র ও নেক আমলের কারণে আজীবন আনন্দিত থাকবে। আর যদি উক্ত পুরুষের দ্বীনদারীর মূল্যায়ন করা না হয়, তাহলে ঐ নারীর পার্থিব জীবন সম্পূর্ণটাই মুসীবতে ভরপুর হয়ে যাবে। এ জন্যই মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "যখন কোন এমন ব্যক্তি তোমাদের নিকট বিবাহের বার্তা প্রেরণ করে, যার চরিত্র ও দ্বীনদারীর প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট। তাহলে তোমরা তার বিবাহের পয়গাম প্রত্যাখ্যান করানো; বরং যে মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে, তার সাথে বিবাহের ব্যবস্থা কর। যদি তোমরা এমনটিই না কর, তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে বড় ধরনের ফেৎনা-ফাসাদ দেখা দিবে।

যদি বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণকারীর মধ্যে দ্বীনদারী ও চরিত্র দেখল না, বরং শুধু মাল ও রূপ অথবা পার্থিব ক্ষমতা, পদ কিংবা উপাধী দেখল এবং এরই উপর ভরসা করে কন্যা বিবাহ দিল, তাহলে ঐ মেয়ের দ্বীনদারী তো ধ্বংস হবেই, যার কারণে তার পারকালও ধবংস হবে। আর ইহজগতেও তার জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হবে না।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে চেনে, জানে, মানে যেহেতু সে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত। এ জন্য সে মাখলূকের হকও আদায় করবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে। আর যে আল্লাহর না, সে কারো না। যে আপন সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তার আহকামের পরওয়া ও মূল্যায়ন করে না, সে তার অধিনস্ত লোকদের হক ও সুখ-শান্তির প্রতি কতটুকু যত্নবান হবে?

আজকাল পাত্রের (বর) মধ্যে দ্বীনদারীর প্রতি ভ্রুক্ষেপও করা হয় না। অন্যান্য জিনিষ দেখে কন্যা বিবাহ দেয়া হয়। কেউ জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষা দেখে, কেউ ধন-সম্পত্তি দেখে, কেউ দুনিয়ারী পদবী ও চাকরী-নৌকরী দেখে কন্যা বিবাহ দেয়। অতঃপর সারা জীবন এর কুফল ভোগ করে। এ সব জেনারেল শিক্ষিত জামাইবাবুরা তিন তালাক দেয়ার পরও স্ত্রীকে প্রাণের প্রাণ বানিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক বৎসর, দু'বৎসর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রেখে মায়ের বাড়ি ফেলে রাখে। না তালাক দেয়, না খোর-পোষ দেয়। কোন কোন চরিত্রহীন শিক্ষিত জালেম স্ত্রীকে গরু পেটা পিটিয়ে

জখম করে দেয়। তখন কন্যার মুরব্বীগণ মুফতীদের স্মরণাপন্ন হয়, নানা দোষ জামাইবাবুর। ঢের অভিযোগ মুরব্বীদের। হুজুর! বড় জালেমের পাল্লায় পড়েছি। লোকটা বদ মেজাজ, ছেলেটা চরিত্রহীন, জালেমের বাচ্চা মাতাল ...... গুন্ডা ...... সন্ত্রাসী ...... ইত্যাদি। মেহেরবানী করে ফতুয়া দেখে জালেমের হাত থেকে নাজাতের একটা ব্যবস্থা করুন। অথচ যখন ঐ শিক্ষিত সন্ত্রাসীর সাথে কন্যা বিবাহ দিচ্ছিল, তখনও তার চরিত্র হুবহু এমনই ছিল। যারা খোদাভীরু দ্বীনদার, তাদের দাড়ি, টুপি দেখে এই কন্যা পক্ষরা ভয় পায়। কন্যা বিবাহ দিতে লজ্জাবোধ করে। মনে মনে ভাবে, যদি ঐ দাড়িওয়ালার নিকট কন্যা বিবাহ দেই, তাহলে আমাদের কন্যা দাড়ির বোঝা বহন করতে না পেরে মাটিতে ডেবে যাবে এবং কন্যার মাতা-পিতা লোক-সমাজে লজ্জিত হয়ে যাবে।

এ সমস্ত মাতা-পিতাদের নিকট যখন দ্বীনদার ছেলে পছন্দনীয় না, তখন বাধ্য হয়েই বে-দ্বীন, টেডী, ক্লীন শেপ ছেলের নিকট কন্যা বিবাহ দেয়। অতঃপর ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত বে-দ্বীন জামাইবাবুরা উল্লেখিত পন্থায় কন্যা ও কন্যা পক্ষকে কষ্ট দেয়। শত আফসোস হয় তখন, যখন শুনি, দ্বীনদার নামাযী পর্দানশীন মেয়েকে পয়সার লোভে মডার্ণ ফ্যামেলীর ছেলের সাথে বিবাহ দিয়েছে। যে ছেলে না তাকে নামায পড়তে দেয়, না পর্দা করতে দেয়, না রোযা রাখতে দেয়; বরং ঐ দ্বীনদার মেয়েকে বেপর্দা হতে, ছায়াছবি দেখতে বাধ্য করে। অন্যথায় সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে। শান্তির নীড়কে বানিয়ে দেয় জাহান্নাম। ঘরে ঘরে আজ অশান্তি এই কারণেই। আজ আমাদের সমাজে উল্লেখিত হাদীস সত্যে পরিণত হয়েছে। যার সারকথা এই যে, দ্বীনদার হওয়ার অপরাধে কোন দ্বীনদার ছেলেকে অবজ্ঞা করে তার সাথে কন্যা বিবাহ না দিলে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হবে। অবশ্য কোন কোন বাহ্যিক দ্বীনদার পাত্র থেকেও কষ্ট পৌছে, অশান্তি সৃষ্টি হয়। প্রকৃত পক্ষে এরা হাকীকী দ্বীনদার নয়। বাতেন তথা আত্মার সংশোধন না হওয়ার কারণে সমাজের জন্য এরাও মুসীবত হয়ে দাড়ায়। প্রকৃত দ্বীনদার তারাই, যাদের জাহেরী বাতেনী উভয় পার্শ উত্তম-চরিত্র ও নেক আমল দ্বারা অলংকৃত, সুসজ্জিত।

যেমনিভাবে দ্বীনদার-খোদাভীরু স্বামী তালাশ করা আবশ্যক, তেমনিভাবে দ্বীনদার স্ত্রী তালাশ করাও আবশ্যক। যে হবে নেক আমলে

অভ্যস্ত। উল্লেখিত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথম হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নারীর মধ্যে দ্বীনদারী দেখে বিবাহ কর। তার ধন-সম্পদ, তার সৌন্দর্য, মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব দেখে বিবাহ করো না। যদি ঘরের স্ত্রী দ্বীনদার না হয়, তাহলে না স্বামীর হক আদায় করবে, না সন্তানদের দ্বীনদার বানাবে। বরং স্বামীর টাকা-পয়সা বেধড়ক অপচয় করবে আর আনন্দ উচ্ছাসে ব্যয় করে স্বামীকে নিঃস্ব বানিয়ে ছাড়বে। নামাহরাম বেগানা পুরুষদের সম্মুখে রূপ-লাবণ্য প্রদর্শন করবে। এমনিভাবে সে স্বামীকে বিভিন্ন পন্থায় অন্তরে আঘাত দেবে, মানসিকভাবে কষ্ট পৌঁছাবে। এরই কারণে প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন-"পৃথিবীর মধ্যে উত্তম সামগ্রী হল নেককার স্ত্রী।"

অনেক পুরুষ এমন রয়েছে, যারা সুন্দরী নারী দেখে দিওয়ানা, মাস্তানা হয়ে যায়। এরা সুন্দরীদের সাদা সাদা গাল তো দেখে, কিন্তু ওদের কালো অন্তরটা দেখেনা। ওরা সুন্দরী তো বটে, কিন্তু ওরা নামাযও পড়েনা, রোযাও রাখেনা। দিন ভর পরনিন্দা ও চোগলখুরীতে ব্যস্ত থাকে। সময় বাঁচলে স্নেহময়ী শাশুড়ী ও নিরিহ ননদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। স্বামীর বেতনটা কব্জা করে নেয়। যদি স্বামী তার স্নেহময়ী মা জননীকে টাকা-পয়সা দেয়, তাহলে অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। মায়ের খেদমত করলে গোসসা হয়ে যায়। বোনকে কিছু দিলে রাগান্বিত হয়ে যায়। প্রথম স্ত্রীর রেখে যাওয়া কন্যাদের পিছনে ব্যয় করলে লড়াই-ঝগড়া করতে করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দেয়। রাতদিন ঝগড়া-ঝাটি স্বামীর জন্য একটা আযাব হয়ে দাড়ায়। সুন্দরী দেখে বিবাহ করলে এমন অসহনীয় অনলে জ্বলে-গুড়ে অন্তর ছাই হয়ে যায়। সংসার হয়ে যায় জাহান্নামের অঙ্গার। এসব বিষাক্ত সুন্দরীদের রূপের ঝলকে চোখ জুড়ায় ঠিক, কিন্তু এরা বিষাক্ত রূপের ঝলকে অন্তরও পোড়ায়।

দ্বীনদার স্ত্রীর স্বামী যদি তার মাতা-পিতার জন্য টাকা-পয়সা খরচ না করে, তবু সে স্বীয় শশুর-শাশুড়ীর পিছনে খরচ করতে স্বামীকে উৎসাহিত করবে এবং সর্বপ্রকার নেক কাজে সৎসাহস ও উৎসাহ সৃষ্টি করবে। নিজেও সকলের অধিকার আদায় করবে, স্বামীকেও হক ও অধিকার আদায়ে সচেতন করবে। আধূনা এ যুগে ছেলেরা টেডি ও মডার্ণ মেয়েকে এবং মেয়েরা চিত্রজগতের নায়ক বা অভিনেতাকে বিবাহ করাকে গৌরব ও কৃতীত্ব মনে করে। কোথাকার দ্বীনদারী আর কোথাকার শভ্যতা? সব কিছু ছিকায় তুলে রাখতে

বলে। দ্বীনদারী, তাকওয়া-পরহেযগারী বর্তমান সমাজে দোষণীয় হয়ে গেছে। দাড়ি-টুপিওয়ালাদের মৌলবাদী বলে গালী দেয়া হচ্ছে। অথচ এরাই আবার আশেকে রাসুল বলে দাবী করে। এটা কি ডাহা অজ্ঞতা ও মূর্খতা নয়?

আজকাল শিক্ষিতা পড়ুয়া মেয়েরাও পিতা-মাতার জন্য মুসীবত ও বোঝা হয়ে গেছে। শুধূ পিতা-মাতার জন্য নয়, বরং বংশ, পরিবার ও সমাজের জন্যেও। মেয়েদেরকে শুধু মেট্রিকই নয় বরং বিএ, এম এ, বি কম, এম কম, মাষ্টার্স ও পি এইচ ডি পর্যন্ত পড়ানো হচ্ছে। এখন গার্জিয়ানরা তাদের জন্য স্বামী তালাশ করে করে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা-দিক্ষায় মেয়ের সমান অথবা তার চেয়ে উচ্চ শিক্ষিত পাত্র পাওয়া যায় না। আর যদিও পাওয়া যায়, কিন্তু ছেলে পক্ষের ডিমান্ড ও শর্তসমূহ কন্যাপক্ষ পূর্ণ করতে অক্ষম। তখন বাধ্য হয়েই সুন্দরী সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েরা ত্রিশ-পয়ত্রিশ বৎসর বরং এর চেয়েও অধিক বৎসর পর্যন্ত বাপের বাড়ী দুর্বিসহ জীবন কাটায়। যে মেয়ে কলেজে আসা-যাওয়ায় অভ্যস্থ, ইউনিভার্সিটিতেও বছর কেটেছে কয়েকটি, তার দ্বীনদার হওয়া এবং পূর্ণ পর্দানশীন হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। দ্বীনদার পুরুষ কখনও এমন মেয়েকে পছন্দ করবে না, আর কলেজ পড়ুয়া মেয়ে দ্বীনদার দাড়ি-টুপিওয়ালাকে পছন্দ করবে না।

এভাবে উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ের জন্য স্বামী অর্থাৎ জোড়া আর মেলেনা। সুতরাং ঐ উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ের হয়ত "বুড়ির" খাতায় নাম লেখায়, নয়ত কোন অশিক্ষিত বেদ্বীন পুরুষের পাল্লায় পড়ে বেদ্বীন হয়ে যায়। অতঃপর উভয়ের মিলনে উৎপাদিত সন্তান খাঁটি নাস্তিক, মুরতাদ বা ইউরিপিয়ান হয়ে যায়। মোট কথা ফেৎনাই ফেৎনা, অশান্তি আর অশান্তি। এই ফেৎনা ও অশান্তির হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রতিটি দ্বীনদার বর পক্ষের মুরব্বীদের একান্ত আবশ্যক এই যে, তারা আপন পাত্রের জন্য অবশ্যই দ্বীনদার, নেককার পাত্রী নির্বাচিত মনোনীত করবেন। কুরআন ও হাদীস শরীফে দ্বীনদার, নেককার নারীর মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হল।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষগুণ

দ্বীনদারী ও সৎকর্মে অগ্রগামী থাকা

যে সমস্ত নারীরা নেককার, সৎকর্মপরায়ণ, পূণ্যবতী এবং যারা দ্বীনদারীকে ভালবাসে, তাদের মর্যাদা ও ফযীলতের কথা কুরআন ও হাদীসে

বর্ণিত হয়েছে। তার "কিছুটা নারী জন্মের আনন্দ" হতে পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থাপন করা হচ্ছে ঃ

"স্মরণীয় সেদিন, যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে, তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটাছুটি করবে। (তাদেরকে) বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য অনন্ত অসীম আনন্দময় জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।" -সূরাহ হাদীদ ঃ ১২

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহাপ্রলয় তথা কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের ঘোরান্ধকারের মহাসঙ্কটের সময় শুধু পুরুষরাই নূরের অধিকারী হবে, তা নয়, বরং পূণ্যবতী নারীরাও সেই নূরের অধিকারী হবে। এটা যে নারী জাতির ফযীলতের প্রমাণ বহন করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মহানবী (সাঃ) বিবাহ-শাদীতে দ্বীনদার নারী নির্বাচিত করার তাকিদ দিয়েছেন এবং তাকে আল্লাহর অনুদান বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আনাছ (রাঃ) হতে এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ যাকে নেককার দ্বীনদার স্ত্রী দান করেছেন, তাকে অর্ধেক দ্বীন দ্বারা সাহায্য করেছেন। এখন তার কর্তব্য হল-সে "তাকওয়া" (খোদাভীরুতা) দ্বারা বাকী দ্বীন অর্জন করুক। -কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ২৭৩

দ্বীনদার-পরহেজগার নারীদের ফযীলত যেমনিভাবে কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা জানা যায়, তেমনিভাবে বিভিন্ন হাদীস দ্বারা জানা যায়। যেমন, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে একটি হাদীস মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী বর্ণনা করেন যে, "এ বিশ্বভূমন্ডল পুরোটাই ভোগ সম্ভার ও আনন্দ উল্লাসের সামগ্রী। তন্মধ্যে সর্বোত্তম সামগ্রী হল নেক ও সৎকর্মপরায়ণ নারী।" -মুসলিম, মিশকাত শরীফ ঃ ২৬৭

অন্য একটি হাদীসে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ! দুনিয়ার (দ্বীনদার) নারীগণ কি আনতনয়না হুরদের চেয়ে উত্তম? নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, দুনিয়ার (দ্বীনদার) নারীগণ সুন্দরী

হুরদের চেয়েও, যেমন কাপড়ের উপরের পিঠ ভিতরের পিঠ থেকে উত্তম। -মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ঃ২৭৭

তফসীরে বাগাভীতে নেককার স্ত্রীর ফযীলত সম্পর্কিত হযরত আলীর (রাঃ) একটি ব্যাখ্যা উল্লেখিত হয়েছে ঃ

হযরত আলী (রাঃ) পবিত্র কুরআনের আয়াত-

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الأخرة حسنة

(রব্বানা-আ-তিনা ফিদ্দুনয়া হাছানাতাউ)- এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন **فى الدنيا حسنة**- -এর অর্থ-পৃথিবীতে নেকী স্ত্রী এবং **وفى الأخرة**- -এর অর্থ- জান্নাত এবং তথায় অবস্থিত পবিত্র নারী অর্থাৎ আনত নয়না সুন্দরী হুরগণ। -তাফসীরে বাগাভী, ১ঃ ১৭৭

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে মুসনাদে ফিরদাউস নামক হাদীস গ্রন্থে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, নেককার ও ফরমাবরদার নারী প্রকৃতপক্ষে স্বামীর ধর্ম-কর্মে সাহায্যকারীণী।" -মুসনাদে ফিরদাউস, ১ ঃ ৩০১

দ্বীনদার নারীর ফযীলত সম্পর্কে আরও একটি হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার দ্বীনদারী ও সৌন্দর্যের ভিত্তিতে বিবাহ করে, তাহলে সে নিজের অধঃপতন (ও অমঙ্গল)-এর পথে প্রতিবন্ধক প্রাচীর নির্মাণ করল।" -ফিরদাউস ১ ঃ ২৯৪

শাশ্বত ইসলাম শুধু নারীর সত্তাটাকেই মূল্যায়ন করেনি, বরং পুরুষদের মত নারীদের জন্য নামায, রোযা, দান-সদক্বাহ ইত্যাদির বিনিময়ে সুন্দর আনন্দময় জীবন এবং অনন্ত অসীম কাল অবস্থানের অনিন্দ্য বাগিচা বেহেশ্‌তের শুভ সংবাদ দান করেছে। এটাও নারী জাতির জন্য বড় সৌভাগ্য ও ফযীলতের বিষয়। মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক, যদি ঈমানদার হয়, তাকে আমি দুনিয়াতে প্রশান্তির যিন্দেগী দান করব এবং পরকালে তাদের আমলের উত্তম প্রতিদানে তাদেরকে পুরস্কৃত করব।"

-সূরাহ নাহ্‌ল, ৯৭

অনুরূপ বিষয়বস্তু সূরাহ নিসায়ও উল্লেখ আছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"যে কেউ পুরুষ কিংবা নারী সৎকর্ম করে এবং (আল্লাহতে) বিশ্বাসী হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট করা হবে না।" -সূরাহ নিসা ঃ ১২৫

পবিত্র কুরআনের "সূরাতুল ফাত্‌হ"- এ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

"যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যান তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরকাল থাকবে এবং যাতে তিনি (আল্লাহ) তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহর কাছে তাদের প্রাপ্য মহাসাফল্য।" -সূরাহ আল-ফাত্‌হ, ৫

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নামায, রোযা তথা সৎকাজে, নেক কাজে পুরুষদের মত নারীরাও ফযীলতের অধিকারী। তারাও হবে মহা সাফল্যের জান্নাতের গর্বিত মালিক।

দ্বীনদার, সৎকর্মশীলা ও নেককার নারীদের ফযীলত বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হযরত উমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নেক ও সৎকর্ম পরায়ণ একজন মহিলা এক হাজার বে-আঁমল পুরুষ হ'তে উত্তম।"

- আনীসুল ওয়ায়েযীন

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "নিশ্চয় পৃথিবীর নেকবখত নারীগণ জান্নাতের মধ্যে সত্তুর হাজার আনতনয়না রূপসী হুরদের চেয়েও উত্তম হবে।" -আত্ তাযকিরা ঃ ৫৫৬

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে এ বিষয়ভিত্তিক একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হুজুর আকরাম (সাঃ)-এর বাণী বর্ণনা করেছেন, "জান্নাতে প্রবেশের সময় সবচেয়ে অগ্রগামী ঐ সমস্ত মহিলাগণ হবেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রগামিণী।" মুসনদে আহমদ, ২ঃ৬৬

এই জাতিয় একটি হাদীস তবারানী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নারীদের উপর সতীত্ব সংরক্ষণবোধ ফরয করেছেন, যেমন পুরুষদের উপর জেহাদ ফরয করেছেন। অতঃপর তাদের

মধ্যে যে ঈমান ও ছাওয়াবের আশায় (সতীত্ব রক্ষা করতঃ) ধৈর্য্য ধারণ করবে, সে শহীদের ছাওয়াব পাবে।" -কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪০৭

আদ্-দুররুল মানসূর গ্রন্থে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযী (রাঃ) বলেন, প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "নেককার মহিলা নেককার পুরুষের বিবাহ বন্ধনে এমন, যেমন বাদশাহর মাথায় মূল্যবান পাথর খচিত তাজমুকুট। আর নেককার লোকের বিবাহ বন্ধনে বদকার মহিলা এমন, যেমন বৃদ্ধ লোকের মাথায় ভারী বোঝা।"

দ্বীনদার নারীর ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে তাবরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "মহিলাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ নেককার মহিলার উপমা সাদা পা বিশিষ্ট কাকের মত। (অর্থাৎ সাদা পা বিশিষ্ট কাকের সংখ্যা যেমন কম, তেমনিভাবে সৎকর্ম পরায়ণ নেককার মহিলাদের সংখ্যাও কম)"-কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪০৯

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে অপর একটি হাদীস নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুরে আকদাস (সাঃ) ইরশাদ করেন, "হে নারী জাতি! তোমাদের মধ্যে যারা নেককার, তারা নেককার পুরুষদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে গোসল দিয়ে খুশবু মাখিয়ে নিজ নিজ স্বামীর নিকট অর্পণ করা হবে। তখন তারা লাল ও হলুদ বর্ণের বাহনের উপর উপবিষ্ট থাকবে। তাদের সাথে ছড়িয়ে থাকা মুক্তার মত কচি কচি শিশুরা পরিবেষ্টিত থাকবে।

-কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪১

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে অপর একটি হাদীস নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুজুরে আকদাস (সাঃ) ইরশাদ করেন, "হে নারী জাতি! তোমাদের মধ্যে যারা নেককার, তারা নেককার পুরুষদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে গোসল দিয়ে খুশবু মাখিয়ে নিজ নিজ স্বামীর নিকট অর্পণ করা হবে। তখন তারা লাল ও হলুদ বর্ণের বাহনের উপর উপবিষ্ট থাকবে। তাদের সাথে ছড়িয়ে থাকা মুক্তার মত কচি কচি শিশুরা পরিবেষ্টিত থাকবে।

-কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪১২

সচ্চরিত্রবতী নারী সম্পর্কিত একটি বাণী হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, "নারী জাতি তিন প্রকার ঃ (১) ঐ নারী, যে সচ্চরিত্রা, বাধ্যগত, প্রফুল্লমনা, কোমল হৃদয় এবং অধিক মুহাব্বতকারী, অধিক সন্তান প্রসবকারীণী, সর্বাবস্থায় স্বীয় স্বামী ও পরিবারের সকলের প্রতি দয়াময়ী। কিন্তু এমন মহিলা কম পাওয়া যায়। (২) দ্বিতীয় ঐ নারী, যে পাত্রের মত (যাতে জিনিষ রাখা হয় এবং বের করা হয়) অর্থাৎ অধিক সন্তান জন্ম দেয়ার উপযুক্ত নয়। (৩) ঐ মহিলা, যে ধোকাবাজ, দাগাবাজ। আল্লাহ যাকে চান, তার উপর এমন মহিলা চাপিয়ে দেন। আর যাকে চান, তার উপর থেকে হটিয়ে দেন।-বাইহাক্বী, ৬ ঃ৭৫, কানযুলুম্মাল ১৬ ঃ ২৫৩

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি মুসলিম নারীকে দ্বীনদার পরহেজগার হিসেবে জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

স্বামীর অবাধ্যদের প্রতি ফেরেশতাদের অভিশাপ

যে সমস্ত নারীরা স্বামীর মানসিক চাহিদা পূরণ না করে স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে, হাদীস শরীফে তাদের নিন্দাবাদ আরো কঠোরভাবে এসেছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

আবু হুরাইয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ "যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, কিন্তু সে আসে না এবং স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়। এ অবস্থায় ফেরেস্তাগণ সেই স্ত্রীকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকে।" -বুখারী ও মুসলিম

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ কোন স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায়, ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে।"

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে, আর সে তা অস্বীকার করে, এ অবস্থায় তার প্রতি স্বামী খুশী না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে আছেন, তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। -বুখারী ও মুসলিম

হযরত মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দ শহরী (রাঃ) উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা এরূপ করেছেন যে, উল্লেখিত হাদীস শরীফে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার আর বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। কারণ, জ্ঞানীদের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। যে নারী অন্যায়ভাবে স্বামীর বিরোধীতা করে, তার নসীহত হাসেল করা উচিত। এই হাদীসের উপর আমল না করার কারণে নির্বোধ স্ত্রীগণ প্রাণপ্রিয় স্বামীদেরকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে বাধ্য করে অথবা সে আপন সতীত্ব হারিয়ে ফেলে। অতঃপর সে আর সচ্চরিত্রবান থাকে না। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন বড় গুরুত্বপূর্ণ ও আশ্চর্য ধরনের বন্ধন। পারস্পরিক একে অপরের দ্বারা যে কামনা-বাসনা পূর্ণ হয়, তা অন্য কারো দ্বারা পূর্ণ হয় না। সুতরাং পারস্পরিক আন্তরিক সুসম্পর্ক খুবই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। যদি, একে অপরের মানবিক কামনা-বাসনা পূর্ণ না করে অথবা পূর্ণ করতে সহায়তা না করে, তাহলে এটা একের পক্ষ থেকে অপরের উপর বড় জুলুম। হুজুর (সাঃ) মানুষের মানবিক চাহিদা উপলব্ধি করতেন। তিনি (সাঃ) ঐ চাহিদা জানতেন, বুঝতেন ও অনুভব করতেন বলেই স্বীয় উম্মতকে হিদায়াত করেছেন, আদেশ দিয়েছেন। ঐ হিদায়াত ও আদেশ অমান্য বা বিরোধীতা করলেই সংসার বে-মজা ও অশান্তিতে ভরে যায়, আর স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বিবাহিত মুসলমানকে উক্ত হাদীসের আমল করার তাউফীক দান করুন।

উল্লেখিত হাদীস শরীফে প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, "স্বামী বিছানায় ডাকলে অস্বীকার করবেনা"; উযর, আপত্তি, অসুখ, অসুস্থতা না থাকলে স্বামীর কথা মেনে নেবে। এই "বিছানায় ডাকা" আর "রাত" এর কথা উল্লেখ করা দৃষ্টান্ত ও উপম স্বরূপ বলা হয়েছে। অন্যথায় এতে রাত দিনের কোন শর্ত নেই। স্বামী যখনই ডাকবে, তখন যেতে হবে, যদি কোন শরয়ী উযর বা অসুস্থতা না থাকে। স্বামীর প্রয়োজন দেখা দিলে প্রয়োজন পূর্ণ করতে হবে। এটা বুদ্ধিমতি আদর্শ স্ত্রীর কাজ। এ জন্য অন্য একটি হাদীসে প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন-

স্বামী যখন স্ত্রীকে তার কোন প্রয়োজনে ডাকে, সে যেন সাথে সাথে তার নিকট চলে আসে, যদি সে (রান্নার কাজে) চুলার নিকট থাকে।

-তিরমিযী শরীফ

সুস্থ বিবেকবান বুদ্ধিমতি স্ত্রীরা স্বামীর কথা মান্য করে। কারণ, স্বামীর কথা মান্য করার মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সাংসারিক সুখ-শান্তি লুকায়িত।

স্বামী নির্যাতনকারীনীদের প্রতি হুরদের বদ দু'আ

সমাজে কতক বধূ এখনও রয়েছে, যাদের স্বামী যদি স্ত্রীর কোন আচরণে কিংবা কথা না মানার কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে, অভিমান করে কথা বন্ধ করে দেয় বা সামান্য রাগারাগি করে, তাহলে উক্ত মহিলা নিজ স্বামীর অসন্তুষ্টি দূর করার পরিবর্তে নিজেও ক্রোধান্বিত হয়ে 'গাল ফুলে গোবিন্দের মা' হয়ে বসে থাকে অথবা দুর্ব্যবহারের দ্বারা স্বামীর অসন্তুষ্টি আরও বৃদ্ধি করে। এটা বুদ্ধিমতির কাজ নয়। যে নারীরা এমন করে, হাদীস শরীফে তাদের নিন্দাবাদ এসেছে ঃ

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যখনই কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে দুনিয়ায় কষ্ট দিতে থাকে, তখনই (বেহেশতের) আয়াতলোচনা হুরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে, সে বলে, (হে অভাগিনী!) তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে মেহমান। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন। -তিরমিযী শরীফ

বাইহাক্বী শরীফে অপর একটি হাদীস নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না এবং তাদের নেকী আকাশের দিকে ওঠে না ঃ (১) পলাতক ক্রীতদাস-যাবৎ না সে আপন মনিবের নিকট ফিরে আসে এবং তাঁর হাতে ধরা দেয়। (২) সেই নারী যার উপর তার স্বামী নারাজ-যাবৎ না সে তাকে রাজি করে এবং (৩) মাতাল-যাবৎ না সে হুশে আসে।

হযরত মাওলানা আশেক ইলাহী কর্তৃক উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ মায়াময়, দয়াময়, মহামহিম আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে সুসজ্জিত করেছেন। সে জান্নাতে বসবাস করবে আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাগণ। নেক বান্দাগণ ঐ জান্নাতে তাদের মুমিন নেককার স্ত্রীদেরকেও পাবে এবং মানব থেকে ভিন্ন প্রকৃতির এক মাখলুক রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে

পয়দা করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে যাদেরকে "হুর" আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই হুরও ঐ নেক বান্দাগণের স্ত্রী হিসেবে খেদমতে হাজির হবে। হুর শব্দটি হুরা শব্দের বহুবচন। যার শব্দার্থ হচ্ছে, শুভ্র বর্ণের নারী। আর ঈন عين শব্দটি আইনা عيناء শব্দের বহুবচন। যার অর্থ বড় বড় চোখের অধিকারিনী নারী। এ হুরেরা রূপ-লাবণ্যে ও সৌন্দর্যে খুব বেশী অগ্রগামী হবে। কিন্তু পৃথিবীর মুমিন নারীগণ হুরদের তুলনায় অত্যাধিক সুন্দরী হবে।

পৃথিবীর মুমিন স্ত্রীগণ জান্নাতে যেয়ে কেমন রূপের অধিকারিনী হবে, তার বিবরণ আমরা মহানবী (সাঃ) এর পবিত্র হাদীস দ্বারা জানতে পাই। ইরশাদ হচ্ছে

"নিশ্চয় পৃথিবীর নেকবখত নারীগণ জান্নাতের মধ্যে সত্তুর হাজার আনত নয়না রূপসী হুরদের চেয়েও উত্তম হবে।" -আত্ তাযকিরা ঃ ৫৫৬

জান্নাতে যেয়ে আল্লাহর নেক বান্দাগণ হুরদেরকেও পাবে এবং জান্নাতী মুমিন স্ত্রীদেরকেও পাবে। সেখানে জান্নাতী পুরুষগণও সীমাহীন সুন্দর হবে। স্বামী এবং উভয় প্রকার স্ত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-ভালবাসা কানায় কানায় পূর্ণ হবে। কারও অন্তরে কারও প্রতি অণুপরিমানও হিংসা বিদ্বেষ বা কীনাহ থাকবে না।

যুগের পর যুগ, শতাব্দী পর শতাব্দী থেকে ঐ জান্নাতী আনতনয়না পরমা সুন্দরী রূপসী হুরগণ তাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রাণপ্রিয় স্বামীদের অপেক্ষায় প্রহর গুণে যাচ্ছে। অধীর আগ্রহে স্বামীদের সাথে সাক্ষাতের জন্য চাতক পাখীর মত পথ পানে চেয়ে আছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর এই স্বামীগণ পৃথিবীতে জীবিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তাদের সাথে সাক্ষাত করতে পারবে না। এক মিনিটের জন্য সাক্ষাত হওয়া সম্ভব না। মৃত্যুর পর কবরের জীবন অতিবাহিত করে, অতঃপর হাশরের ময়দান অতিক্রম করে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন হুরগণ তাদের চির প্রতিক্ষিত প্রাণপ্রিয় স্বামীদের সাক্ষাৎ পাবে এবং স্বামীগণ হুরদের পেয়ে পরিতৃপ্ত হবে। হুরদের সাথে তাদের প্রাণপ্রিয় স্বামীদের মিলন হবে পরকালে। কিন্তু এখন থেকেই তাদের হৃদয়গভীরে পৃথিবীবাসী স্বামীদের জন্য এমন ভালবাসা গচ্ছিত রাখছে যা কল্পনাতীত। পৃথিবীবাসী স্ত্রী যখন জান্নাতী স্বামীকে মানসিক ও শারীরিকভাবে কষ্ট দেয় বা নির্যাতন করে, তখন জান্নাতবাসী হুরগণ প্রতিবাদ

করে বলে, তাকে কষ্ট দিও না। সে তো তোমার নিকট গুণাগুণতির ক'দিনের মেহমান। অনতিবিলম্বে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে। তার মূল্য ও মর্যাদা আমরা দেব। অনন্ত অসীমকাল অবস্থানকারী আমাদের স্বামীকে কষ্ট দিও না, দুঃখ দিও না, অন্তরে ব্যথা দিও না, শারীরিক নির্যাতন করো না। জান্নাতবাসী হুরদের প্রতিবাদ ও আর্তনাদের শব্দ পৃথিবীবাসী স্ত্রীদের কর্ণে তো ভেসে আসে না। কিন্তু দয়াময় ও প্রতাপশালী মহান আল্লাহর সত্য নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হুরদের ঐ প্রতিবাদের ধ্বনী স্বীয় উম্মতের পাষাণী স্ত্রীদের নিকট পৌছে দিয়েছেন। তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জান্নাতবাসী হুরগণ তোমাদের নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ কি ভাষায় করছে।

যে লোকেরা নেক কাজ করে এবং হারাম উপার্জন ও নাজায়েয কাজ থেকে বিরত থেকে নামায, রোযা যত্ন সহকারে আদায় করে। ঘটনাক্রমে তাদের অনেককে তাদের স্ত্রীরা একটু বেশী জালাতন করে, কষ্ট দেয়। এদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে জান্নাতী হুরগণ বদ দু'আ দিতে থাকে। তারা বলে, "তোমাদের অমঙ্গল হোক। পৃথিবীতে অবস্থানকারী অল্প ক'দিনের মুসাফিরকে কষ্ট দিও না। সে (স্বামী) তোমাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।" তাই পৃথিবীবাসী স্ত্রীদের উচিত হুরদের বদ দু'আ থেকে বাঁচা এবং সর্বাবস্থায় স্বামীর সাথে সদাচরণ করা। স্বামী ফর্সা হোক, কালো হোক, শ্যামলা হোক, প্রেম-ভালবাসা দিয়ে, আদর-সোহাগ দিয়ে স্বামীর হৃদয় জয় করার চেষ্টা করা। যারা কালো স্বামীকে ঘৃণা করে না, তারা বড় ফযীলতপ্রাপ্তা। এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

কালো স্বামীকে ঘৃণা না করা

স্ত্রী নেককার, পরহেযগার, খোদাভীরু ও বুদ্ধিমতি হওয়ার একটি নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে যেমন স্বামী দান করেছেন, তার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা। এমন ভদ্র মেয়েরা কিছু না পেয়েও নিজেকে খুশী, সুখী, আনন্দিত ও প্রফুল্ল উপলব্ধি করে। নিজেকে ধন্য মনে করে। যেমন ইমাম আছমাঈ নিজের একটি বাস্তব ও শিক্ষনীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি এক

প্রত্যন্ত গ্রাম্য অঞ্চলে সমবিব্যহারে গিয়েছিলাম। ,,,,, আমি এক পরমা সুন্দরী মহিলাকে এক কুশ্রী পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দেখতে পেলাম। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কিভাবে এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী হয়ে গেলে? উত্তরে সে বলল, আপনি কথা বন্ধ করুন। আপনি একথা জিজ্ঞাসা করে কাজটা বেশী ভাল করেন নি। বরং নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। .... কারণ, আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী হয়ত এমন কোন নেক কাজ করেছেন, যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে আমার মত সুন্দরী, তন্বী-তরুণী ও রূপসী স্ত্রী দান করেছেন। আর সম্ভবতঃ আমার দ্বারা এমন কোন নাফরমানীর কাজ প্রকাশ পেয়েছে, যার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা আমার ভাগ্যে এমন স্বামী নির্বাচিত করেছেন। যদ্বারা এ নশ্বর জগতে আমার প্রায়াশ্চিত্তের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা যাকে আমার জন্য পছন্দ করলেন, আমি তাকে পছন্দ করব না কেন? মেয়েটির কথায় হযরতুল আল্লামা ইমাম আছমাঈ (রাঃ) নিরব, নিস্তব্ধ ও নিথর হয়ে গেলেন।

এমন আরো একটি আকর্ষণীয় ঘটনা "আক্বদুল ফরীদ" নামক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। হযরত ইমরান ইবনে হাত্তান এর স্ত্রী খুব সুশ্রী, সুন্দরী ও রূপসী ছিলেন। তিনি (স্ত্রী) একদিন শ্রীহীন কুদর্শন স্বামী হযরত ইমরানকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে, আমরা দু'জনেই জান্নাতে যাব। ইমরান বললেন, তা কিভাবে? স্ত্রী বললেন, আপনার মত সৌষ্ঠবহীন কুশ্রী স্বামী হয়ে আমার মত সুশ্রী স্ত্রী পেয়ে আপনি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছেন। আর আমি? আমি আপনার মত সৌন্দর্যবিহীন পুরুষ পেয়েও ধৈর্য্যধারণ করেছি, আর শুকরিয়া আদায়কারী ও ধৈর্য্যধারণকারী উভয়েই জান্নাতে যাবে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা একজন নারীকে কুশ্রী-সুশ্রী যেমন স্বামী দান করেন না কেন, তার উপর রাজী খুশী থাকা যেমন একজন খোদাভীরু ও নেককার স্ত্রীর কর্তব্য, তেমনিভাবে একজন পুরুষকে আল্লাহ তা'আলা সুন্দরী বা অসুন্দরী যেমন স্ত্রী দান করুন না কেন, তার উপর সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক; বরং ঈমানদারীর আলামত। আর লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, সকলেই যদি সুন্দরী ও রূপসী স্ত্রীর ধান্দায় হন্যে হয়ে খুজতে থাকে, তাহলে কালো ও শ্যামলা মেয়েদের বিয়ে করবে কে? এ কথাটি পুরুষদের বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

রাগী স্বামীর রাগ কমানো

স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ নিজের উপর, সন্তানের উপর সহানুভূতি দেখিয়ে এবং নিজের বংশের সম্মান রক্ষার্থে ক্ষমা চেয়ে স্বামীর মেজাজকে শীতল করে দিবে। যদিও ভুল নিজের না হয়, তবুও সে সময় কোন জবাব দিবে না। সম্পূর্ণ চুপ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে। নিজের ভুল স্বীকার করে অঙ্গীকার করবে, ভবিষ্যতে এমন আর হবে না। নিম্নের তদবীরের উপর আমল করবে।

স্বামী ও সন্তানদেরকে ঘরে প্রবেশ করার দু'আ শিক্ষা দিবে এবং এর উপর আমল করাবে। যখন ঘরে প্রবেশ করবে, তখন সূরা ফাতেহার সাথে সূরা ইখলাছ, দরূদ শরীফ ও দু'আ পড়ে সালাম দিয়ে প্রবেশ করবে। দু'আর অর্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।

হে আল্লাহ! আমি ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি ও আল্লাহর নামে বের হচ্ছি এবং আমাদের পালনকর্তা আল্লাহর উপরই ভরসা করছি।

স্মরণ রাখবে, দু'আ শুধু পড়েই ক্ষান্ত হবে না, বরং ভাষা ও অর্থ বুঝে দু'আ চাইবে। যদি শয়তান থেকে আশ্রয় না চেয়ে ঘরে প্রবেশ করে এবং দু'আ না পড়ে, তাহলে শয়তান ঘরে প্রবেশ করে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেয়।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেছেন, যখন মানুষ ঘরে প্রবেশ করে জিকির করে এবং খাওয়ার সময় জিকির করে, তখন শয়তান তার সাথীদেরকে বলে, তোমরা রাতে ঘরে অবস্থান করতে পারবে না এবং রাতের পানাহারেও অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। আর যদি ঘরে প্রবেশ করার পর জিকির না করে, তাহলে শয়তান বলে যে, রাতে থাকার সাথে সাথে খাবার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।

স্বামী রাগান্বিত হলে তার করণীয় চিকিৎসা নিম্নে প্রদত্ব হল ঃ

১ম চিকিৎসা ঃ হাদীস শরীফে রয়েছে যে, দাঁড়ানো অবস্থায় রাগান্বিত হলে বসে পড়বে। বসে রাগান্বিত হলে, শুয়ে পড়বে। স্বামী স্ত্রী একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দিবে যে, আপনি বসে পড়ুন। পানি পান করে নিন, ওযু করে নিন, ইত্যাদি। রাগ দমন করার জন্য উল্লেখিত পদ্ধতি অবলম্বন করবে।

রাগ জ্ঞান বুদ্ধি ধ্বংস করে দেয়। বিভিন্ন প্রকারের রোগ জন্ম দেয়। আপশে দুশমনি সৃষ্টি করে দেয়। পক্ষান্তরে যদি রাগ দমন করে নেয়, তাহলে অনেক নেকী ও কল্যাণের অধিকারী হয়।

স্বামী রাগ সংবরণ করতে না পারলে সংশোধনকারীর বিপরীত সে নিজে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

অতএব, স্বামীর সম্মুখে স্ত্রী যতবড় অপরাধী হোক না কেন? তথাপি নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও স্থিতিশীলতার মাঝে কোন তফাৎ সৃষ্টি করবে না। আর তুমি যদি মা হওয়ার পাশাপাশি সন্তানের হিতাকাংখী হও, তাহলে এতটুকু হিদায়েতই যথেষ্ট।

কুরআন কারীমের হেদায়েত অনুযায়ী দ্বিতীয় কর্তব্য হল, চিন্তা ফিকির করে কার্য সমাধান করবে। সংশোধন ও পরিশুদ্ধতার দৃষ্টিকে সামনে রেখে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে, যা সবচেয়ে বেশী ভাল ও কার্যকরী। যার ফল হবে এই যে, এক দিকে স্ত্রী, সন্তান ছাত্র ও কর্মচারীগণ নিজেদের কাজের উপর লজ্জিত হবে ও নিজেদের ভুলের উপর অনুতপ্ত হবে, অপর দিকে স্বামী, পিতা, শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টির বিপরীত মুহাব্বত ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রী ও সন্তান তোমার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে আগের চেয়ে বেশী ভালবাসা উপহার দিবে।

মন্দকে অতি সুন্দর উপায়ে দূর করবে। যদি তুমি চিন্তা ভাবনা করে অতি সুন্দর উপায়ে মন্দকে দূরীভূত করার পন্থা অবলম্বন কর, তাহলে এটাই হবে খুব সুন্দর ও উত্তম পন্থা। এছাড়া ফল হবে এই যে, যার সাথে তোমার শত্রুতা, বিরোধিতা, বৈরিতা ছিল, সে হিতাকাংখী ও অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে।

দ্বিতীয় চিকিৎসা ঃ নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাগ দমন করে নেয়, আল্লাহ পাক কাল কিয়ামতের দিন সকলের সামনে ডেকে বলবেন, হুরদের মধ্যে তোমার যাকে পছন্দ হয় গ্রহণ কর। কত বড় ফযীলত। সুতরাং এদিকে লক্ষ্য রাখার দরকার। রাগের সময় খেয়াল করে রাগ দমন করে নিবে। জান্নাতের হুরদের মালিক হওয়ার গৌরব অর্জন করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। রাগ দমনের ফযীলত পবিত্র কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- "তারা যখন রাগান্বিত হতেন ক্ষমা করে দিতেন।" এমনিভাবে আল্লাহ পাক মুত্তাকী ও পরহেযগার লোকদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে। যারা সর্বাবস্থায় নিজেদের রাগকে সংবরণ করে, আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীল দিগকেই ভালবাসেন।"

ফাযায়িলে সাদাকাতে হযরত শাইখুল হাদীস যাকারীয়া (রহঃ) লিখেছেন, এই আয়াতের মধ্যে মুমিনদের আরো একটি প্রশংসা করা হয়েছে। তাহল, রাগ সংবরণ করা ও লোকদেরকে ক্ষমা করে দেয়া। উলামাগণ লিখেছেন, যখন তোমার স্বামীর ভুল হয়ে যায়, তখন তার জন্য সত্তরটি (অসংখ্য) উযর, আপত্তি, বাহানা তৈরী করে নিজের অন্তরকে বুঝাও যে, তাঁর নিকট কত উযর। যখন তোমার অন্তর এটা কবুল না করে, তখন ঐ ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে নিজেকে ভর্ৎসনা, তিরস্কার কর, নিন্দা জ্ঞাপন কর। এবং নিজেকে বল, তুমি এত কঠর, এত পাষাণ হলে কি করে? তোমার ভাই-বোন অসংখ্য উযর বর্ণনা করতেছে, আর তুমি তা কবুল করতেছ না। যত অসুবিধাই হোক, তোমার স্বামীর উযর কবুল কর। কেননা, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির সামনে উযর পেশ করা হয়, অথচ সে কবুল করে না, সে অবশ্যই পাপিষ্ট। অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, মানুষ যদি রাগ সংবরণ করে এবং দমন করে নেয়, সে ব্যক্তির এ কাজটিকে আল্লাহ পাক খুবই ভালবাসেন।

তৃতীয় চিকিৎসা ঃ ইমাম আহম্মদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যদি কারো রাগের উদ্রেক হয়, তাহলে তার উচিত চুপ থাকা।

রাগের সময় স্ত্রী স্বামীকে চুপ থাকার উপদেশ দিবে, এবং স্মরণ করিয়ে দিবে যে, নবী করীম (সঃ) রাগের সময় চুপ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। নবী করীম (সঃ)-এর নির্দেশ মানা আমাদের জন্য আবশ্যক। এর মধ্যেই আমাদের কল্যাণ, ও মঙ্গল নিহিত। সুতরাং আপনি একটু শান্ত হন, এবং আমাকে ক্ষমা করে দিন। ভবিষ্যতে আপনার পছন্দের বাইরে কোন কাজ করব না। আপনি একটু শান্ত হয়ে অন্য কাজে মনোনিবেশ করুন। অতীতের সবকিছু ভুলে যান। একে অপরকে বলবে, রাগ খুব খারাপ জিনিস। এটা জলন্ত আগুন। এ জন্য রাগের সময় সম্পূর্ণ চুপ থাকতে হবে। অন্যথায় এ আগুনে আমাদের উভয়কে জ্বলে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যেতে হবে।

চতুর্থ চিকিৎসা ঃ আত্ম সংযমের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে একটু হাটাহাটি

করবে। আর স্বামী মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে অথবা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করবে। ঐ স্থান থেকে একটু দূরে যাবে।

ইমাম আহম্মদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ জেনে রাখ, রাগ একটি অগ্নিস্ফুলিংগ যা মানুষের অন্তরকে জ্বালিয়ে দেয়। তুমি কি রাগান্বিত ব্যক্তিকে অগ্নিশর্মা হতে দেখনি? সুতরাং যে ব্যক্তি বুঝবে যে, তার শরীরে ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে, তখন তার উচিত মাটির দিকে তাকান। অর্থাৎ বিছানায় শুয়ে পড়া এবং কবরের চিন্তা করা।

পঞ্চম চিকিৎসা ঃ যে ব্যক্তির শরীরে বেশী রাগ জন্ম নেয়, তার চিকিৎসা হল, একটা কাগজে নিম্নের দু'আ লিখে আসা যাওয়ার পথে নজরে পড়ার মত স্থানে ঝুলিয়ে রাখবে। "তাদের উপর তোমার যতটুকু কর্তৃত্ব, তার চেয়ে বেশী কর্তৃত্ব তোমার উপর আল্লাহ পাক রাখেন।" অর্থাৎ স্ত্রী, সন্তান, কর্মচারী, ছাত্র অথবা অধিনস্ত লোকদের উপর তোমার যতটুকু কর্তৃত্ব, আল্লাহ পাক তার চেয়ে বেশী কর্তৃত্ব তোমার উপর রাখেন। সুতরাং এমন না হয় যে, অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশী দেওয়া হয়েছে, তাহলে দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি প্রাপ্ত হবে। কিয়ামতের দিন অপরাধ ও শাস্তি পরিমাপ করা হবে। যদি সমান হয়, তাহলে মাফ পাবে। অন্যথায় শাস্তির যোগ্য গণ্য হবে।

রাগ ঐ ব্যক্তির উপরই সৃষ্টি হয়, যে নিজের থেকে দুর্বল। আর যদি শক্তিধর, প্রভাবশালী লোক হয়, তাহলে তার উপর রাগ আসে না। বরং কোন প্রভাবশালী লোকের সামনে রাগ আসেই না। সুতরাং যখন ঐ দু'আটি বার বার দেখবে এবং অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ রাখবে, তাহলে আর রাগ আসবে না।

৬ষ্ঠ চিকিৎসা ঃ নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেন, যখন কারো দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ আসে, তাহলে সে যেন বসে পড়ে। আর যদি তাতেও রাগ সংবরণ না হয়, তাহলে শুয়ে পড়বে। (আবু দাউদ খন্ড ঃ ২ পৃঃ ৩০৩) অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস রাখা যায় যে, এর চেয়ে বেশী আর কোন তদবীরের প্রয়োজন হবে না। কেননা, মানুষের শরীর দাঁড়ানো অবস্থায় জমীন থেকে অনেক দূরে থাকে, বসার দ্বারা জমীনের নিকটবর্তী হয়। শোয়ার দ্বারা জমীনের সাথে মিশে যায়। আর জমীনের মধ্যে আল্লাহ পাক এক প্রকার নম্রতা রেখেছে, যা মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে। ফলে নম্রতা ক্রোধ-অহংকারকে ধ্বংস করে খাঁটি সোনার মানুষে পরিণত করে।

অভিজ্ঞতার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, রাগের সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে মন চায় এমন অবস্থায় সৃষ্টি করা যে, ভেঙ্গেচুরে মেরে-কেটে সব কিছু তছনছ করে ফেলা। উদাহরণ স্বরূপ, শোয়া অবস্থায় রাগ আসলে অনিচ্ছাকৃতভাবে বসে পড়া। বসা থাকলে দাঁড়িয়ে যাওয়া এটা মানুষের প্রকৃতিগত, চরিত্রগত অভ্যাস। বসে পড়া অবস্থা রাগের আসল অবস্থা থেকে একটু দূরে, আর শুয়ে পড়া অনেক দূরের। দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ আসলে বসে পড়বে, বসা অবস্থায় রাগ আসলে শুয়ে পড়বে এটা মানুষের জন্মগত, অভ্যাসগত শিক্ষা।

মোট কথা, এ সকল তদবীর দ্বারা রাগ সংবরণ করতে চেষ্টা করবে। কেননা, রাগের অনিষ্টতা অনেক বংশকে ধ্বংস ও বিরান করে ফেলেছে। অনেকের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। অনেক সুহাসিনী দিবাকরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিয়েছে, অনেকের অন্তরকে ব্যথায় দহনে ভরপুর করে দিয়েছে। অনেকের মায়ার বাঁধন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অনেকের মাথার উপর থেকে সুশীতল ছায়া সরিয়ে ফেলেছে। অনেকের স্নেহ, মমতা আর বন্ধুত্বের প্রদীপ নির্বাপিত করে দিয়েছে।

এগুলি শুধু স্বামীর রাগের কারণেই সংঘটিত হয় নি; বরং স্বামীর রাগের সাথে স্ত্রীর মুখরাপা না এবং রাগের প্রতি উত্তর রাগের দ্বারা দেয়ার কারণেই হয়েছে। সমাজের গুণীজনরা এর সাক্ষী। মন্দ আচরণের উত্তর দুর্ব্যবহার দ্বারা দেয়া। ধিক্কার, তিরস্কার, ভর্ৎসনার জবাব ধিক্কার, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা দ্বারা দেয়া। নম্রতার জবাব কঠরতার দ্বারা দেয়া। এ সকল আচরণ ঘর ধ্বংস ও বিরান করার কারণ। আল্লাহ পাক আমাদের পুরুষ ও মহিলাদেরকে এই সকল আধ্যাতিক, আত্মিক, রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

আদর্শ স্ত্রী বিশেষগুণ

মুখের ভাষা মিষ্টি হওয়া

মিষ্টি ভাষা এমন এক গুণ, যা দ্বারা বড় বড় লোকও নিজের অনুসারী ও ভক্তবৃন্দ হয়। কথায় আছে, "মিষ্টি ভাষা দ্বারা মানুষ হাতীকেও একটি দড়ি দ্বারা বাঁধতে পারে।" মিষ্টি ভাষায় মানুষ যা ইচ্ছা করতে পারে। মিষ্টি ভাষা এমন এক যাদু যা দ্বারা প্রিয়জন ও শত্রুদের উপর রাজত্ব করা যায়। মিষ্টি ভাষা মহিলাদের দোষ ত্রুটিও গোপন করে রাখে। এক মহিলার মধ্যে যদি

দুনিয়ার সকল গুণ থাকে, কিন্তু বদজবান ও মুখরাপনা থাকে, তাহলে তার সকলগুণ ধুলোয় মিশে যায়। যদি স্ত্রীগণ মিষ্টি ভাষার যাদু দ্বারা পাষাণ স্বামীদেরকে মেহেরবান স্বামীতে পরিণত করতে চায়, তাহলে তা পারে।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষগুণ

স্বামীর বিশ্রামের প্রতি লক্ষ্য রাখা

স্ত্রীর উচিত স্বামীর প্রতি সবসময় বিশেষ লক্ষ্য রাখা। তার পোশাক, খাদ্য, বিশ্রাম সুস্থতা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রতি লক্ষ্য রাখা। স্বামীর সন্তুষ্টি নিজের সন্তুষ্টি। মনে রাখবে, স্ত্রীর জন্য সর্ব প্রথম স্বামীর মেজাজ জানা দরকার। স্বামী কোন কথায় খুশি হন, কোন কথায় বেজার হন, স্বামীর হুকুম মানা তার গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। স্ত্রীর উচিত স্বামীর সকল প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা। জ্ঞানী স্ত্রীগণ খেদমত করে স্বামীদের মন জয় করে নেয়। এমন স্ত্রী সকল ধরনের চাহিদা পূরণ করে এবং তার কোন চাহিদা অপূরণ রাখেনা। এমন মহিলারা স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করে। যে সকল মহিলারা চায় নিজেদের রূপ লাবণ্য আর সৌন্দর্যের দ্বারা স্বামীর উপর কর্তৃত্ব চালাতে, তাহলে এটা তদের ভুল ধারণা।

জানা দরকার, স্বামী সুন্দর স্ত্রীর গোলাম হয় না; বরং খেদমতে প্রবল আগ্রহী স্ত্রীর গোলাম হয়। শ্রমিক স্বামী যখন সন্ধ্যায় ঘরে প্রবেশ করে খেদমতকারীনী স্ত্রীকে দেখে, তখন তার সারা দিনের দুঃখ-কষ্ট বিলীন হয়ে দুঃখ ভুলে গিয়ে মনটা সুখ-শান্তিতে ভরে যায়।

যার প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট সে জান্নাতী

প্রকৃত পক্ষে গুণবতী, জ্ঞানবতী, ভাগ্যবতী নারী তারাই, যারা স্বামী ভক্তা, স্বামী অনুরক্তা এবং যারা অনন্ত প্রেম দিয়ে, অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়ে, অমায়িক ব্যবহার ও ধৈর্য দিয়ে তথা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সদা-সর্বদা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখে। যে নারীর প্রতি স্বামী সন্তুষ্ট থাকে, হাদীস শরীফে তাঁর ফযীলত এসেছে। তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হতে এ সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

"যে কোন স্ত্রীলোক এমন অবস্থায় মারা গেল, যখন তার স্বামী তার ওপর সন্তুষ্ট, সেক্ষেত্রে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।" -তিরমিযী

স্বামীর খেদমতে নিয়োজিত আদর্শ স্ত্রীর ফযীলত

"যার স্বামী সন্তুষ্ট, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে" একথা বাস্তব সত্য। তবে স্বামী তখনই সন্তুষ্ট হবে, যখন স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রেখে স্বামীর খেদমত করবে। এছাড়া, সুন্দর ও সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দৈনিক জীবনের কাজ-কর্ম, রান্না-বান্না, ঘর সাজানো, ঘর গোছানো, সন্তান লালন-পালন, স্বামীর ধন-সম্পদ হিফাযত করবে। উল্লেখিত গুণসমূহ অর্জন করা প্রতিটি নারীর জন্য আবশ্যক। বিশেষ করে যারা আদর্শ স্ত্রী হতে চায়, তাদের জন্য তো একান্ত আবশ্যক। কারণ, কোন নারী বা বধূ শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও দান-সদক্বার বিনিময়ে ছাওয়াব প্রাপ্ত হয়-তা নয়, বরং তারা দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্ম, রান্না-বান্না, স্বামীর খিদমত করা, কাপড় ধোয়া, ঘর সাজানো, ঘর গোছানো, সন্তান গর্ভে ধারণ, সন্তান জন্মদান, সন্তান লালন-পালন, স্বীয় সতীত্ব সংরক্ষণ, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার ধন-সম্পদের হিফাযত করা প্রভৃতি কাজের বিনিময়েও অতুলনীয় ছাওয়াবের অধিকারী হয়। বিভিন্ন হাদীস দ্বারা আমরা এসব তথ্য জানতে পাই। আদ্-দুররুল মানসূর নামক প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এ সম্পর্কিত একটি হাদীস হয়েছে ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, কতিপয় মহিলা হুজুর (সাঃ)- এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল, যে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! পুরুষরা তো জিহাদ ফী-সাবীলিল্লাহের মাধ্যমে নারীদের থেকে অগ্রগামী হয়ে গেল। আমাদের জন্য কি কোন আমল এমন রয়েছে, যাদ্বারা আমরা ছাওয়াবের দিক দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের সমান হতে পারব? দয়ার নবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, "তোমাদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন ঘরের কাজ-কর্ম করা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর আমলের সমান মর্যাদা রাখে।"

- মাজমাউয যাওয়ায়েদ-৪ঃ৫৫৯

ঘর গোছানো, ঘর সাজানো, স্বামীর খেদমতে নিয়োজিত পর্দানশীন মহিলাদের ফযীলত সম্বলিত একটি দীর্ঘ হাদীস হযরত আসমা বিনতে

ইয়াযীদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

তিনি মহানবী (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন- যখন নবীজী (সাঃ) সাহাবাগণের মাঝে ছিলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আমি মুসলিম মহিলাদের প্রতিনিধি স্বরূপ আপনার সমীপে আগমন করেছি। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাই আমরা নারী জাতি আপনার উপর এবং আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু আমরা নারীরা গৃহে আবদ্ধ হয়ে থাকি। পর্দার সাথে গৃহে অবস্থান করি। আপনাদের (পুরুষ স্বামীদের) গৃহে বসবাস করি। আপনাদের সব প্রয়োজন পূর্ণ করি। আমরা আপনাদের সন্তান পেটে ধারণ করি। এতদসত্ত্বেও আপনারা পুরুষরা আমাদের তুলনায় ছাওয়াবের কাজে অনেক অগ্রগামী। যেমন, আপনারা জুমু'আর নামাযে শরীক হন, নামাযের জামা'আতে অংশগ্রহণ করেন, অসুস্থ ব্যক্তিদের খোঁজ-খবর নেন, জানাযার নামায আদায় করেন, একের পর এক হজ্জ করতে থাকেন। উল্লেখিত সমস্ত আমল থেকে আরো উত্তম আমল জিহাদ (তাতেও আপনারা শরীক হন)। যখন আপনারা পুরুষরা হজ্জ অথবা উমরা আদায় করেন, কিংবা জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন, তখন আমরা আপনাদের ধন-সম্পত্তির হিফাযত করি, আপনাদের জন্য বস্ত্র তৈরী করি, আপনাদের সন্তান লালন-পালন করি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাদের এ কাজগুলো করে দেয়ার পর আমরা কি আপনাদের সেই নেক কাজের ছাওয়াবে অশীদার হব না? মহানবী (সাঃ) এ বক্তব্য শ্রবণ করে উপস্থিত সাহাবাগণের দিকে সম্পূর্ণ চেহারা ফিরিয়ে ইরশাদ করলেন, তোমরা কি এই মহিলার তুলনায় ধর্মের ব্যাপারে উত্তম প্রশ্নকারিনী কোন মহিলার কথা শুনেছ? সমস্বরে সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কল্পনাও ছিল না যে, কোন মহিলার এমন প্রশ্নের বুঝ আসবে! এরপর হুজুর আকরাম (সাঃ) হযরত আসমার (রাঃ) প্রতি লক্ষ্য করে ইরশাদ করলেন, তুমি যাও হে রমণী! এবং যে সমস্ত মহিলারা তোমাকে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করেছে, তাদের জানিয়ে দাও যে, নারীরা স্বীয় স্বামীর সাথে সদ্ব্যবহার করা, স্বামীর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা এবং তার কথার উপর আমল করা ইত্যাদির দ্বারা পুরুষদের সমস্ত নেক ও ভাল কাজের সম পরিমাণ ছাওয়াবের অধিকারী হবে।" হযরত

আসমা (রাঃ) মহানবীর (সাঃ) এ অমিয় বাণী শ্রবণ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর বড়ত্ব তাকবীর-তাহলীল পড়তে পড়তে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কানযুল উম্মাল গ্রন্থে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "যেই মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রামাযান মাসে রোযা রাখবে, স্বীয় লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং নিজ স্বামীর কথা মত চলবে, সেই মহিলাকে বলা হবে- তুমি যে দরজা দ্বারা প্রবেশ করতে চাও, বেহেশতে প্রবেশ কর।" -কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪০৬

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন, "ঐ নারী সবচেয়ে উত্তম, যে সচ্চরিত্রের অধিকারিনী এবং স্বামী সোহাগিণী, অর্থাৎ স্বীয় চরিত্রের হিফাযত করে এবং স্বামীকে খুব ভালবাসে।"

-আল-জামিউস সগীর ও কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪০৯

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রিয় নবী (সাঃ)-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন, "উত্তম নারী তোমার ঐ স্ত্রী, যখন তুমি তার পাণে দৃষ্টিপাত করবে, তোমাকে সন্তুষ্ট করে দিবে। যখন কোন আদেশ করবে, তোমার অনুসরণ করবে। যখন তুমি তার থেকে (কোন কাজ ইত্যাদির কারণে) দূরে থাকবে, তখন সে নিজের এবং তোমার মালের হিফাযত করবে। এরপর নবীজী (সাঃ) এ কথার স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত

الرجال قوامون على النساء

তিলাওয়াত করলেন।

-কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ২৮২/আদ-দররুল মানসূর, ২ ঃ ১৫১

স্বামীভক্তা নারীর ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে মিশকাত শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল, মহিলাদের মধ্যে উত্তম কে? মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "যে মহিলা নিজ স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখে-যখন সে তার দিকে তাকায়; স্বামী যখন কোন কাজ করতে বলে, তার অনুসরণ করে এবং যে কাজ স্বামী অপছন্দ করে, তাতে নিজের এবং স্বামীর সপক্ষে স্বামীর বিরোধিতা করে না।" -মিশকাত শরীফ, ২৮৩

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হ'তে আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "ঐ মহিলার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক, যে রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠায়। যদি স্বামী 'না' বলে, অর্থাৎ না উঠতে চায়, তাহলে চেহারায় পানি ছিটায়।"

-মুসনাদে আহমাদ/কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪০৯

কানযুল উম্মাল কিতাবে স্বামী স্ত্রীর ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ আল-ওযাহী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে এক সাহাবী উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! আমি যখন ঘরে আগমন করি, তখন আমার স্ত্রী বলে, "শুভেচ্ছা স্বাগতম-আমার গৃহকর্তার আগমন!" আর যখন আমাকে চিন্তিত, মনোঃক্ষুন্ন দেখে, তখন বলে, "দুনিয়ার চিন্তা কিছুই নয়। আখিরাত তো আপনার জন্য আছেই।" তখন মহানবী ইরশাদ করলেন, তুমি তাকে সুসংবাদ দাও যে, সে আল্লাহর রাহে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত এবং সে মুজাহিদের অর্ধেক ছাওয়াবের অধিকারিনী।- কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪১০

স্বামীর ফরমাবরদার নারীদের ফযীলত সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

ইবনে আবু উযাইনা সাদাফী ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে মুরসাল রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "তোমাদের জন্য উত্তম স্ত্রী ঐ নারীরা, যারা অধিক পরিমাণে সন্তান জন্ম দেয়, স্বামীর শুভাকাংখিনী ও ফরমাবরদার হয়। কিন্তু (শর্ত হল-) তারা আল্লাহ ভীরু হতে হবে। আর তোমাদের জন্য নিকৃষ্ট স্ত্রী ঐ নারী, যারা বেগানা লোকদের নিকট নিজের রূপ-লবাণ্য ও সৌন্দর্য প্রদর্শনকারিনী ও অহংকারিনী হয় এবং অন্তরে মুনাফেকী গচ্ছিত রাখে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু যারা শুভ্র পা বিশিষ্ট কাকের মত। অর্থাৎ ঐ অবস্থাতেও যাদের আমল অণুপরিমান ভাল হবে, তারা শুভ্র পা বিশিষ্ট কাকের মত অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হবে এবং কিছু কাল আযাব ভোগ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী- ৭ ঃ ৮২

স্বামী ভক্তা নারীর ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত আলী (রাঃ) হতে মহানবী (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী বর্ণিত হয়েছে,

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলাকে ভালবাসেন, যে তার স্বামীর সাথে মধুময় জীবন যাপন করে এবং নিজেকে সদা পূতপবিত্র রাখে।

-কানযুল উম্মাল, ২ ঃ ৪০৩

বাইহাকী শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত জাবির (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইরশাদ বর্ণনা করেন, নারী জাতি তিন প্রকার ঃ প্রথম প্রকার পাত্রের মত, যাতে আসবাব পত্র রাখা হয় এবং বের করা হয় (অর্থাৎ সন্তান ধারণের ক্ষমতা নেই)। দ্বিতীয় প্রকার খুজলী (চুলকানী) বিশিষ্ট উটের মত (অর্থাৎ অকর্মণ্য)। তৃতীয় প্রকার ঐ সব মহিলা, যারা নিজ স্বামীদেরকে খুব ভালবাসে, (অধিক) সন্তান জন্ম দেয় এবং (দ্বীন ও) ঈমান রক্ষার্থে স্বামীকে সাহায্য করে। এমন নারী স্বামীর জন্য (মূল্যবান) খনির চেয়েও উত্তম।

-বাইহাকী- শু'আবুল ঈমান, ৬ ঃ ৪১৭

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষগুণ

স্বামীর হক জানা ও মানা

স্বামীর হক কত বড় এবং স্বামীর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে একটি হাদীস তিরমিযী শরীফে রয়েছে ঃ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "আমি যদি কোন ব্যক্তির সামনে সিজদা করার নির্দেশ দান করতাম, তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।"

-তিরমিযী শরীফ

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ হযরত বুলন্দ শহরী (রাঃ) বলেন, বিশ্ব বিধাতা আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে মাতা-পিতার বিরাট মর্যাদা দিয়েছেন এবং তাদের আদেশ মান্য করার হুকুম দিয়েছেন, তেমিনভাবে স্বামীকেও বড় মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন। স্ত্রী গৃহের অভ্যন্তরের কাজ কর্ম সম্পাদন করে আর স্বামী পরিশ্রম ও মেহনত করে টাকা উপার্জন করে এবং পরিবারের, সংসারের ব্যয়ভারের মধ্যে স্ত্রীর ব্যয়ভারও অন্তর্ভূক্ত। সামাজিক দৃষ্টিতে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে স্ত্রীর যা অধিকার, স্ত্রীর যা চাহিদা, স্বামীরা তার চেয়েও মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করে থাকে। পুরুষদেরকে মহাগ্রন্থ আল কুরআন

,,,,,,, **অর্থাৎ** তত্ত্বাবধায়ক সরদার বলেছে এবং অন্য আয়াতে এও ইরশাদ করেছে যে, নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। পবিত্র কুরআনের এই অমীয় ও শাশ্বত বাণীকে পৃথিবীর অনেক জাতি স্বীকার করে না। তাদের নারীরা নিজেদেরকে পুরুষদের সমতুল্য অথবা তারও উপর নিজেদের মর্যাদা মনে করে। ঐ সমস্ত জাতির এ সিদ্ধান্ত, ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা প্রকৃতির বিরোধী এবং সহজাত স্বভাবের পরিপন্থী। এর কুফল, কুপ্রভাব ও কুপরিণতী তাদের সম্মুখে উপস্থিত। তারা প্রতিনিয়ত এর অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর ফলাফল দেখতে পাচ্ছে। প্রতিটি পরিবার এ নীতির দুর্ভোগ পোহাচ্ছে।

পুরুষ তত্ত্ববধায়ক, রক্ষক এবং নেগাহবান। পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করে। স্ত্রীর মনোরঞ্জনে ব্যয় করে। তাই প্রতিটি স্ত্রীর জন্য স্বীয় স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তার অনুগত ও বাধ্যগত থাকা আবশ্যক। তবে শর্ত হল, স্বামী যেন শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের আদেশ না করে। হাদীস শরীফে এর তাকীদ করা হয়েছে যে, স্ত্রীরা যেন শরীয়ত অনুযায়ী ইসলামের ফরযসমূহ যথাযথভাবে পালন করে। গুনাহসমূহ হতে বেঁচে চলে এবং স্বামীর অন্তর জয় করার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখে। স্বামীর অন্তরে, মনে, শরীরে, প্রশান্তি সৃষ্টি করে এবং তার অবাধ্যতা না করে। যদি এমতাবস্থায় স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতে যাবে ইনশাআল্লাহ। কেননা, স্ত্রী যখন আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করেছে এবং বান্দার হকও আদায় করেছে, (যার মধ্যে স্বামীর হকও রয়েছে) তাহলে তার জান্নাতে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক আর রইল বা কে?

হাদীস শরীফে স্বামীর হক ও অধিকারের গুরুত্বারোপ করতে যেয়ে প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা হারাম এবং শিরক। যদি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম, তাহলে নারীদের আদেশ দিতাম স্বামীদেরকে সেজদা করার জন্য।" এই হাদীস শরীফে স্বামীদের হক আদায়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার তাকীদ দেয়া হয়েছে। তবে স্বামীদেরও কর্তব্য স্ত্রীদের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এভাবেই সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদা করা হারাম। কিন্তু আমাদের সমাজে কোন কোন নির্বোধ অশিক্ষিতা নারী এখনও রয়েছে, যারা পীর,

ফকীর এবং মাজারে সেজদা করে। এরা মাজারে, কবরে তাযিআকে সেজদা করে সন্তান এবং মনের মুরাদ কামনা করে। এ কাজ জঘণ্য পাপ ও মারাত্মক হারাম এবং শিরক। এ হারাম কাজ থেকে বাঁচা এবং পরহেয করা প্রতিটি মুমিন নারী-পুরুষের কর্তব্য।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

স্বামীকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা

আনন্দ-উল্লাস, ভোগ-বিলাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এ বিশ্ব বসুন্ধরায় ধনী-দরিদ্র সকলেই আকাঙ্খা করে জীবনটা একটু শান্তিময় হোক। সামর্থানুযায়ী প্রত্যেকেই আনন্দমুখর, অনাবিল সুখ-শান্তিতে ভরা জীবন কাটাতে চায়। কিন্তু কয়জনের ভাগ্যে জোটে শান্তিময় দাম্পত্য জীবন? এটা আল্লাহ প্রদত্ত এক বড় নেয়ামত। এ নেয়ামত ভাগ্যে তখনই জোটে, যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উভয়ের অধিকার আন্তরিকভাবে আদায় করে। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে গুণীজনরা বলেছেন যে, সংসারে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তিময় জীবন-যাপন করে সুখী সংসার গড়তে পুরুষের তুলনায় নারীর ভূমিকাই বেশী। একজন নারীর কারণে সংসার পরিণত হয় জাহান্নামে। আবার এই নারীর কারণে সংসার পরিণত হয় জান্নাতে; সংসারে দেখা দেয় অনবিল স্বর্গীয় শান্তি। তাই নারীকে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। তাদের উচিত হবে স্বামীদের সাথে বে-আদবী ও উগ্র আচরণ না করে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে সম্মান প্রদর্শন করা এবং অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় ও যে কথায় বা কাজে স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেন বা রাগ করেন, তা থেকে বিরত থাকা। স্বামী থেকে কোন অযাচিত বিষয়ের সম্মুখীন হলে, স্বামীকে উপরস্থ এবং নিজেকে স্বামীর, অধীনস্থ মনে করে নীরবতা অবলম্বন করবে। প্রেম ভালবাসা, নম্রতা, ভদ্রতার মাধ্যমে স্বামীর মন জয় করবে। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে হলেও স্বামীকে সদা-সর্বদা সন্তুষ্ট রাখবে। স্ত্রীর নিকট হতে স্বামী কতটুকু শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান পাবার যোগ্য, তা আমরা বিশ্বের সেরা মানব, আদর্শের মূর্তপ্রতীক মহানবী (সাঃ)-এর মুখ নিঃসৃত বাণী হতে জানতে পাই।

হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "হে

নারী জাতি! তোমরা যদি জানতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কি হক (অধিকার), তাহলে তোমাদের প্রত্যেকেই স্বামীর চেহারার ধুলা-বালি নিজ চেহারায় মাখার চেষ্টা করতে। -ইবনু আবী শাইবা, ৩ ঃ ৩৯৮

স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, মহিলাদের উপর সবচেয়ে বড় হক স্বামীর এবং পরুষদের উপর সবচেয়ে বড় হক মা জননীর। -হাকিম/কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৩৩১

স্বামীর মর্যাদা সম্পর্কে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত হুসাইন ইবনে মুহসিন আল আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তার ফুফু একদা মহানবীর (সাঃ) দরবারে গেলেন, নবীজী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি স্বামী আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আছে। নবীজী (সাঃ) বললেন, তুমি এদিকে লক্ষ্য রাখবে যে, তার (স্বামীর) সাথে তোমার আচার-ব্যবহার কেমন। কেননা, সে-ই তোমার বেহেশ্‌ত এবং সে-ই তোমার দোযখ।

-ত্ববরানী, হাকিম, কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৩৩৭

স্বামীর মর্যাদা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি করা প্রতিটি আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। এতে তারই কল্যাণ, তারই মঙ্গল। পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও প্রেম-ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য স্বামীর শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে স্বামী কতটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র, সে সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম একদল মুহাজির ও আনসারের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় একটি উট এসে তাঁকে সিজদা করে। সাহাবীগণ বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে পশু ও গাছ সিজদা করে। (আর আমরা মানুষ) সুতরাং আপনাকে সিজদা করার আমরাই অধিক উপযুক্ত। তিনি বললেনঃ আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তোমাদের ভাইকে (অর্থাৎ আমাকে) শুধু তা'জীম করবে। আমি যদি কাউকে (অপরকে) সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীকেই তার স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম। স্বামী যদি তাকে হলুদ রঙ্গের

পাহাড় হতে কালো রঙ্গের পাহাড়ে এবং কলো রঙ্গের পাহাড় হতে সাদা পাহাড়ে পাথর স্থানান্তর করতে বলে, তবুও তার এটা করা উচিত।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

সর্বদা স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা

প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমতি, জ্ঞানবতী তারাই, যারা প্রেম দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে সব সময় স্বামীর মন জয় করে রাখে। স্বামীর সামান্যতম অসন্তুষ্টি যাদের বরদাশত হয় না। ছলে-বলে, কলে-কৌশলে অসন্তুষ্ট স্বামীকে সন্তুষ্ট হতে বাধ্য করে। হাদীস শরীফে এমন নারীদের বড় প্রশংসা এসেছে ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, "আমি কি তোমাদিগকে জান্নাতীগণের কথা বলব না? নবীগণ জান্নাতী, সিদ্দীকগণ জান্নাতী, শহীদগণ জান্নাতী, এমনিভাবে শহরের এক প্রান্তে বসবাসকারী কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাতকারী জান্নাতী, আর ঐ মহিলাও জান্নাতী, যে অধিক পরিমাণে সন্তান জন্ম দেয়। অধিকন্তু, স্বামীর রাগান্বিত অবস্থায় বা নিজের রাগান্বিত অবস্থায় স্বামীর হাত কোমলভাবে আঁকড়ে ধরে বলে, হে প্রাণপ্রিয়! যতক্ষণ আপনি সামান্য সময়ের জন্য হলেও আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হবেন, আমি কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করব না। এভাবে সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে নেয়।" নাসায়ী শরীফ

আদ-দুররুল মানসূর গ্রন্থে স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনে নিয়োজিত নারী ফযীলতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করেন, "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য এটা জায়িয নয় যে, স্বামীর ঘরে এমন লোককে আসতে দিবে- যাকে স্বামী অপছন্দ করে। এমনিভাবে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হবে না। স্বামীর ব্যাপারে অন্য কারো অনুসরণ করবে না। আর স্বামীকে কথায় কথায় রাগ ধরাবে না। নিজের বিছানা স্বামী হতে পৃথক করবে না, তাকে প্রহার করবে না। স্বামী যদি প্রকৃত পক্ষে জুলুম করে, তাহলে কাছে এসে তাকে সন্তুষ্ট করবে। যদি সে মেনে নেয়, তাহলে তো ভাল কথা। আল্লাহ তা'আলাও ঐ নারীর উযর কবুল করবেন। আর যদি স্বামী সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে ঐ নারীর উযর আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেছে। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।

—আদ-দুররুল মানসুর, ২ ঃ ১৫২

আমাদের সমাজে কতক মহিলা এমনও রয়েছে, যারা স্বামীর মান-সম্মান, খেদমত, শ্রদ্ধার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। চলা-ফেরায় বেপরওয়া ভাব থাকে। স্বেচ্ছাচারিণীর মত স্বামীর অনুমতি ছাড়াই শপিং সেন্টারে মার্কেটিং করতে, পার্কে ঘুরতে, বান্ধবী বা বাপের বাড়ি বেড়াতে চলে যায়। স্বামীর অনুমতি বা অসন্তুষ্টির কোন পরওয়াই করে না। অথচ এটা মারাত্মক অপরাধ। এ জাতিয় নারীরা নারী জন্মের কলংক। ইসলামী শরীয়ত নারী জাতির এ ধরণের স্বেচ্ছাচারিতার অনুমতি দেয় না। স্বামীকে স্ত্রীর জন্য এমন শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র বানিয়েছেন যে, স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল (ইবাদত যেমন-) রোযা (ইত্যাদি) রাখা হালাল নয়। হাদীস শরীফে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকাকালীন অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে (নফল) রোযা রাখা হালাল নয়। তার অনুমতি ছাড়া অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমিত দেয়াও তার জন্য হালাল নয়।

স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর কোন কাজ করাই উচিত নয়। বরং প্রতিটি কথার, প্রতিটি আদেশের অনুসরণ করা কর্তব্য। এতেই নারী জন্মের সার্থকতা। এ সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি জিহাদে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে স্বীয় স্ত্রীকে নসীহত করল যে, সে যেন বাড়ীর উপরতলা থেকে নীচ তলায় না নামে। ঐ মহিলার পিতা নীচ তলায় বসবাস করত। অতঃপর হঠাৎ ঐ মহিলার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন ঐ মহিলা মহানবী (সাঃ)-এর নিকট সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করে নিজ পিতাকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি চাইল। মহানবী (সাঃ) তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, হে নারী! আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় স্বামীর নির্দেশের অনুসরণ কর। এ ঘটনার ক'দিন পরই তার পিতার মৃত্যু হল। ঐ মহিলা স্বীয় পিতার মৃত্যুতে তাযিয়ত (সমবেদনা ও শোক) প্রকাশের জন্য অনুমতি গ্রহণের লক্ষ্যে নবীজীর (সাঃ) নিকট দরখাস্ত করল। কিন্তু মহানবী (সাঃ) পূর্বের ন্যায় এবারও নিষেধ করলেন এবং স্বয়ং নিজে তাশরীফ আনলেন। দাফন-কাফনের পর ঐ মহিলার নিকট শুভ সংবাদ প্রেরণ করে বললেন, "আল্লাহ তা'আলা

তোমার স্বামীর কথা মান্য করার কারণে তোমার পিতাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" -আদ-দুরুল মানসূর, ২ ঃ ১৫৪

যে সমস্ত নারীরা আল্লাহ, রাসূল ও পরকালে বিশ্বাসী, তাদেরকে স্বামীর আর্থিক সামর্থের অতিরিক্ত ভোগ বিলাসী হওয়া এবং সাজ-সজ্জা, খোরপোষের দাবী করা অনুচিত। মহানবী (সাঃ) খাইবার যুদ্ধের পর অতিরিক্ত খোরপোষ দাবী করার কারণে স্বীয় স্ত্রীগণের প্রতি প্রচন্ডভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশের জন্য তাঁদের নিকট হতে একমাস পৃথক থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট পৌছার অনুমতি চাইতে আসলেন। দেখলেন, বহু লোক তাঁর দরজায় বসে আছে, তাদের কাউকেও অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। জাবের (রাঃ) বলেন, কিন্তু আবু বকরের জন্য অনুমতি দিলেন এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর উমর (রাঃ) আসলেন এবং অনুমতি চাইলেন। তাঁকেও অনুমতি দেয়া হল। উমর (রাঃ) হুজুরকে বিমর্ষ অবস্থায় চুপ করে বসে থাকতে দেখলেন, তখন তাঁর বিবিগণ তাঁর চারিদিকে বসা। উমর (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি এমন এক কথা বলব, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে হাসি ফুটাবে। তখন উমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! যদি আপনি দেখতেন- (আমার বিবি) বিনতে খারিজা আমার কাছে এরূপ খোরপোষ চাচ্ছে, আমি উঠে তার ঘাড়ে কিছু লাগিয়ে দিতাম। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন এবং বললেন, "এই যে এরা আমার চারিপাশে ঘিরে আছে দেখছেন, তারা তাদের খোরপোষ চাচ্ছে।" জাবের (রাঃ) বলেন, এ সময় আবু বকর উঠে তাঁর কন্যা আয়িশার ঘাড় মটকাতে লাগলেন এবং উমর উঠে তাঁর কন্যা হাফসার ঘাড় মটকাতে লাগলেন এবং তাঁরা উভয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহর নিকট এমন জিনিষ চাচ্ছ, যা তাঁর নিকট নেই। তখন তাঁরা বললেন, খোদার কসম, আমরা আর কখনো রাসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট এমন জিনিষ চাইব না, যার তাঁর নিকট নেই।

আল্লাহ তা'আলা সকল আদর্শ স্ত্রীকে কুরআন হাদীস অনুযায়ী স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন করার তাউফীক দিন।

কাউকে অভিশাপ দেয়া বদ স্বভাব

এ পর্যায়ে হযরত মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দ শহরী একটি হাদীস পেশ করছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর আকরাম (সাঃ) একদা ঈদুল ফিতর অথবা ঈদুল আজহার নামায আদায় করার জন্য ঈদগাহে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথি মধ্যে একদল মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হল, অর্থাৎ তাদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। নবীজী (সাঃ) তাদের সম্বোধন করে ইরাশদ করলেন, হে রমণীগণ! সদকা প্রদান কর। কেননা, আমি তোমাদের (নারীদের) কে দোযখবাসীদের মধ্যে অধিক দেখতে পেয়েছি। রমণীগণ প্রশ্ন করল, কি কারণে ইয়া রাসুলুল্লাহ ! নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন ঃ এর কারণ এই যে, তোমরা অন্যকে অভিশাপ খুব বেশী দাও এবং স্বামীর নাশুকরী কর। অতঃপর ইরশাদ করলেন, আমি বিবেক-বুদ্ধি ও ধর্মে নারীদের চেয়ে অন্য কাউকে দুর্বল দেখিনি। তারা অনেক জ্ঞানী-গুণী পুরুষের বিবেক-বুদ্ধিকেও নিঃশেষ করে দেয়। রমণীগণ প্রশ্ন করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের বুদ্ধি ও ধর্মে দুর্বলতা (অর্থাৎ কম) কিরূপে? নবীজী (সাঃ) ইরাশদ করলেন, তোমাদের কি জানা নেই যে, নারীদের সাক্ষ্য পুরুষদের অর্ধেক? তারা বলল, জী হ্যাঁ, এমনই তো বটে। অতঃপর ইরশাদ করলেন, এমন নয় কি? যখন মহিলাদের হায়েয (ঋতুস্রাব) আসে, তখন (শরীয়তের আদেশ অনুযায়ী) না নামায পড়তে পারে, না রোযা রাখতে পারে। রমণীগণ বলল, হ্যাঁ, এমনই তো বটে। ইরশাদ করলেন, এটা তাদের ধর্মকর্মে দুর্বলতা অর্থাৎ এ কারণে তারা ধর্মেও কম।

ব্যাখ্যাঃ উল্লেখিত হাদীসটি বেশ ক'টি উপদেশ ও নসীহতকে অর্ন্তভূক্ত করেছে। সবক'টির ব্যাখ্যা খুব মনযোগ সহকারে পাঠ করুন। "দোযখে অধিক সংখ্যায় আমি মহিলাদের দেখেছি" এ বাক্য দ্বারা এ কথা জানা গেল যে, জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা অধিক হবে। নারী-কিংবা পুরুষ যারা কাফের অথবা মুশরিক কিংবা মুনাফিক বা বেদ্বীন হবে, তারা তো সর্বদা জাহান্নামে বসবাস করবে। আর অনেক মুসলমানও স্বীয় বদ আমলের কারণে জাহান্নামে যাবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলার মরজী হবে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পৌছে দিবেন। দোযখের অধিবাসীর মধ্যে নারীদের সংখ্যা অধিক হবে। আর তাদের দোযখের

যাওয়ার বেশ কয়েকটি হেতু রয়েছে। নারীদের যা সাধারণতঃ অবস্থা অর্থাৎ নামায না পড়া বা কাজা করা, অলংকারের যাকাত না দেয়া, কর্কষ ভাষা ও বদমেজাজী, স্বামীকে অবহেলা করা ইত্যাদি। এগুলোর সবক'টি কবীরা গুনাহ। যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন, তাহলে জাহান্নাম নির্ঘাত ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা সকলকে ক্ষমা করুন।

সদক্বা দাও দোযখ থেকে বাঁচ

পূর্বোল্লেখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের প্রতি উপদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দান সদক্বা করা। সদক্বা দোযখ থেকে মুক্তির ব্যাপারে বড় ভূমিকা রয়েছে। অন্য একটি হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

সদক্বা দিয়ে দোযখ থেকে বাঁচা যদিও খেজুরের এক টুকরা দ্বারা হলেও উক্ত হাদীসে ফরয সদক্বা অর্থাৎ যাকাত এবং নফল সদক্বা অর্থাৎ সাধারণ দান-দক্ষিণা সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব কিছুই দোযখ থেকে মুক্তির ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই যতদূর সম্ভব, দান-সদক্বা কর, আল্লাহর পথে মাল ব্যয় কর। নিজের ধন-সম্পত্তিতে তো পূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে, অনুমতি নিয়ে স্বামীর সম্পত্তি থেকে খরচ করা যেতে পারে।

দান-সদক্বা করা মহিলাদের জন্য একটি মহৎ গুণ। এ গুণ অর্জন করা প্রতিটি আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। কারণ, এটা বড় ফযীলতের কাজ।

আদর্শ স্ত্রীর মহৎগুণ

দান-সদক্বা করা

কুরআন-হাদীসের দান-সদক্বার বড় ফযীলত ও দানকারীর প্রশংসা ও গুণকীর্তন বর্ণিত হয়েছে। মহাপবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

"যদি তোমরা (নারী-পুরুষ) প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা কতইনা উত্তম। আর যদি গোপনে দান কর এবং অভাবগ্রস্তদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাজ-কর্মের খুব খবর রাখেন।"

—সূরাহ বাকারাহ ঃ ২৭১

দান-সদক্বার ফযীলতের একটি হাদীস তিরমিযী শরীফে রয়েছে ঃ "দান-সদক্বাকারী আল্লাহর নিকটবর্তী, বেহেশতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, (তবে) দোযখ হতে (অনেক) দূরে।" —তিরমিযী শরীফ

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"তোমরা দান-সদক্বার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে। কেননা, বিপদাপদ তাকে অতিক্রম করতে পারে না।" (অর্থাৎ দান-সদক্বার বরকতে বালা-মুসীবত দূরীভূত হয়।) —মিশকাত শরীফ

দান-সদক্বা এমন ফযীলতপূর্ণ যে, তা আল্লাহর ক্রোধকেও বিগলিত করে। এ সম্পর্কে তিরমিজী শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন,

"যখন আল্লাহ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠ সৃষ্টি করলেন, তখন ভূ-পৃষ্ঠ কাঁপতে লাগল। অতঃপর (ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন রোধকল্পে) আল্লাহ তা'আলা পাহাড় সৃষ্টি করলেন এবং তার উপর পেরেক স্বরূপ মারলেন। ভূ-পৃষ্ঠ স্থির হয়ে গেল। ফেরেশতাকুল পাহাড়ের এ শক্তি অবলোকন করে আশ্চর্যান্বিত হয়ে আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! পাহাড় হতেও কি অধিক শক্তিধর সৃষ্টি আপনার রয়েছে? উত্তর এল- হ্যাঁ! লৌহ এর থেকে আরো শক্তিশালী। তা পাহাড়কেও ভেঙ্গে দেয়। তারা বলল—হে রাব্বুল আলামীন! লোহার চেয়েও অধিক শক্ত কোন বস্তু কি আপনি সৃষ্টি করেছেন? উত্তর এল-হ্যাঁ, আগুন-যা লোহাকে গলিয়ে দেয়। পুনরায় প্রশ্ন করা হল, আগুন হতে শক্তিশালী আপনার কোন সৃষ্টি আছে কি? উত্তর এল হ্যাঁ, পানি-যা আগুনকে ধ্বংস করে দেয়। আবার প্রশ্ন করা হলো-এমন আরো কি আছে, যা একেও হার মানিয়ে দেয়? উত্তর এল-বায়ু, যা পানিতে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তারা পুনরায় জানতে চাইল, এর চেয়েও উচ্চতর কোন বস্তু আছে কি না। উত্তর এল- এ বিশ্ব চরাচরে সর্বাধিক শক্তিশালী হল বনী আদমের গোপনীয় সদক্বা, তা আমার ক্রোধকে বিগলিত করে দেয়।" - তিরমিজী শরীফ

সদক্বা এমন ছাওয়াবের কাজ, যা উভয় জগতের সফলতা বয়ে আনে। এতে অংশ গ্রহণে আরো বহু ফযীলত রয়েছে। এ সদক্বার বিনিময় দানের ক্ষেত্রে দয়াময় আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে বঞ্চিত না করে সুস্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করলেন ঃ

"নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেবে, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ। আর (পরকালে) তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান।" -সূরা আল-হাদীদ, ১৮

দান সদক্বাকারীণী নারীদের ফযীলত সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী সাকীফ গোত্রের কন্যা যয়নব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা সদক্বা কর, এমনকি গহনাপত্র দিয়ে হলেও।" তিনি (যয়নব) বলেন, আমি (স্বীয় স্বামী) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে ফিরে এসে তাকে বললাম, আপনি গরীব এবং সামান্য ধন-সম্পদের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে (স্ত্রীলোকদেরকে) সদক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, আমার সদক্বা-খয়রাত আপনাকে দিলে যথার্থ হবে কি না? অন্যথায় অন্য লোকদের দিয়ে দেব। আবদুল্লাহ বললেনঃ বরং তুমি গিয়েই তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে এস। তাই আমি বের হয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি, রাসূরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় আরো একজন আনসার মহিলা অপেক্ষা করছে। তার ও আমার একই প্রসংগ। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এক মহান ও অলৌকিক অবস্থা বিরাজ করছিল।

বিলাল (রাঃ) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গিয়ে খবর দিন, দু'জনু মহিলা দরজায় অপেক্ষা করছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে, "আমরা যদি আমাদের স্বামীদের ও আমাদের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীমদের দান-খয়রাত করি, তবে তা কি আমাদের জন্য যথার্থ হবে কি না? কিন্তু আমরা কে, এ সম্পর্কে আপনি তাঁকে অবহিত করবেন না।" বিলাল (রাঃ) রাসূরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ রাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ স্ত্রীলোক দু'জন কে? তিনি বললেন, এক আনসারী মহিলা, আর যয়নব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এ কোন্ যয়নব? বিলাল (রাঃ) বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রাঃ) স্ত্রী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাদের উভয়ের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে ঃ (এক), আত্মীয়তা রক্ষার সওয়াব, (দুই), দান-খয়রাতের সওয়াব। –বুখারী ও মুসলিম

দান-সদক্বা সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ) তিনি বলেন ঃ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ "যখন স্ত্রী তার ঘরের খাদ্য-দ্রব্যের অংশ নষ্ট না করে তা দান করে, তখন তার ছাওয়াব হয় দান করার কারণে এবং স্বামীর ছাওয়াব হয় উপার্জন করার কারণে। আর মাল রক্ষক খাজাঞ্চীরও মিলে অনুরূপ ছাওয়াব। এতে একের ছাওয়াব অপরের ছাওয়াবে কিছুমাত্রও কম করবে না।" –বুখারী ওমুসলিম

স্ত্রী যদি স্বামীর সুস্পষ্ট অনুমতি নিয়ে স্বামীর মাল থেকে কাউকে দান করে, তাহলেই সে দানের পূর্ণ ছাওয়াব পাবে, কিন্তু স্ত্রী যদি মনে করে বা জানে যে, ছোট খাট কোন জিনিষ দান করলে, অথবা গরীব-মিসকীনকে খানা খাওয়ালে স্বামী অসন্তুষ্ট হবেন না কিংবা দেশে বা এলাকায় স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মাল হতে টুকটাক কিছু দেয়ার প্রথা চালু থাকে, আর তা অনুমতি ছাড়াই দান করে, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রীর ছাওয়াব অর্ধেক। দান-সদক্বা সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে।

হযরত আবু হুরাইয়া (রাঃ) বলেন ঃ নবীজী (সাঃ) বলেছেন, "যখন স্ত্রী স্বামীর উপার্জন হতে তার অনুমতি ব্যতীত দান করে, তখন তার ছাওয়াব হয় স্বামীর অর্ধেক।

পূর্বোল্লেখিত "অভিশাপ দেয়া বদ স্বভাব" শিরোনামে হযরত আশেকে ইলাহী বুলন্দ শহরী কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীসটিতে অধিক সংখ্যক নারীদের দোযখে প্রবেশের একটি কারণ মহানবী (সাঃ) এটা ইরশাদ করেছেন যে, তারা অন্যকে অভিশাপ খুব বেশী দেয়। অর্থাৎ ধমকানো, শাসানো, মারামারি, ঝগড়া-ঝাটি, পিটাপিটি, গালা-গালী, গিবত-শেকায়েত, চোগলখুরী, কুটনামী করা ইত্যাদি নারী একটি বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করে। স্বামী, সন্তান-সন্ততি, ভ্রাতা, ভগ্নি, ঘর, দোর, জীব-জন্তু, আগুন, পানি ইত্যাদি মোট কথা সবকিছুকে দোষরোপ করে, গালাগালী দেয়,

অভিশাপ দেয়। এমনিভাবে ওর ঘরে আগুন লাগেনা কেন? ওকে কলেরায় ধরে না কেন? ওর উপর ঠাঠা পড়ুক। ওকে নিমুনিয়ায় ধরুক। ও তো পোড়া কপালে। ও ধ্বংস হোক। ওর উপর আকাশ ভেঙ্গে পড়ুক। ওকে কুফায় পেয়েছে। ওকে মরণে ধরে না কেন? বাঁদর মুখো, অলক্ষুণে, হতভাগা, ছন্নছাড়া........ ইত্যাদি অগণিত আকথা–কু-কথা মহিলাদের মুখে প্রবহমান থাকে। এতে বদদু'আও অন্তর্ভূক্ত থাকে। কোন কোন শিক্ষিতা নারীর মুখে এ সমস্ত কুকথা অনবরত চলতে থাকে। এসব কথা আল্লাহর খুবই অপছন্দ। এ জাতীয় অশালীন ভাষাকে প্রিয় নবীজী (সাঃ) দোযখে নেয়ার উপকরণ বলেছেন। অভিশাপ দেয়া, যেমন, একথা বলা যে, অমুকের উপর লানত অথবা অমুক ব্যক্তি অভিশপ্ত বা বিতাড়িত, ধিকৃত কিংবা ওর উপর আল্লাহর গজব পড়ুক, ও আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হোক ইত্যাদি কথা বঁড় কঠিন। আল্লাহ তা'আলা রহমত থেকে দূর হওয়াকে লানত বা অভিশাপ বলে। সাধারণতঃ এরূপ বলা যেতে পারে যে, কাফেরদের উপর আল্লাহর লানত হোক। এমনিভাবে মিথ্যুক ও জালেমের উপর আল্লাহর অভিশাপ। কিন্তু কারো নাম নিয়ে অভিশাপ দেয়া জায়েয নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত এ কথা সুস্পষ্ট না হয় যে, সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। মানুষ তো মানুষ, বাতাশ, পানি, আগুনকেও অভিশাপ দেয়া জায়েয নেই।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হুজুর আকদাস (সাঃ) এর নিকট আগমন করল। সে বাতাশকে অভিশাপ দিল। নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, বাতাশকে অভিশাপ দিও না। কেননা, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ প্রাপ্ত। আর যে ব্যক্তি কোন এমন বস্তুকে অভিশাপ দেয়, যে বস্তু অভিশাপের উপযুক্ত না, তাহলে ঐ অভিশাপ স্বয়ং অভিশাপকারীর উপর পতিত হয়। –তিরমিযী শরীফ

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয় মানুষ যখন কোন জিনিষকে অভিশাপ দেয়, তখন ঐ অভিশাপ আকাশের দিকে আরোহণ করে, আকাশের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়। উপরে আরোহণের কোন পথ পায় না। অতঃপর ভূ-পৃষ্ঠের দিকে অবতরণ করে। ভূ-পৃষ্ঠের দ্বারও বন্ধ দেয়া হয়। অবতরণ করার কোন পথই সে খুঁজে পায় না, যেখানে সে অবতরণ করবে। অতঃপর সে ডানে বামে রাস্তা খোঁজে। যখন কোন দিকেই পথ খুঁজে পায় না, তখন উক্ত ব্যক্তির উপর অভিশাপ ফিরে আসে, যাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। যদি ঐ ব্যক্তি অভিশাপ প্রাপ্তির

উপযুক্ত হয়, তাহলে তার উপর পতিত হয়। আর যদি অভিশাপের উপযুক্ত না হয়, তাহলে অভিশাপকারীর উপর পতিত হয়।

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ একে অপরকে আল্লাহর লানত দিও না। এও বলনা যে, তোর উপর আল্লাহর ক্রোধ। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে এরূপও বল না যে, তুই জাহান্নামে যা।
–তিরমিযী, আবু দাউদ

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর একটি স্মরনীয় ঘটনা

মহানবী (সাঃ) এর সর্বাধিক প্রিয় সাহাবী, ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণমানব, প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর রসনা হতে একবার কোন গোলাম (দাস) সম্পর্কে অভিশাপ সম্বলিত কিছু শব্দ বের হয়ে গেল। ঘটনা ক্রমে প্রিয় নবীজী (সাঃ) ঐ স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বিরক্ত ও আশ্চর্যের সুরে ইরশাদ করলেন ঃ

لعانين وصديقين كلا ورب الكعبة

অর্থাৎ অভিশাপকারী এবং সিদ্দীকীন (দুটো এক সাথে একত্রিত হতে পারে কি?) একথা হযরত আবু বকর (রাঃ) অন্তরে বিরাট প্রভাব ফেলল। তিনি ঐ দিনই জনৈক দাসকে (কাফফারা স্বরূপ) মুক্ত করে দিলেন এবং নবীজীর (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আগামীতে এমনটি আর হবে না। -বাইহাকী

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে অভিশাপকারী কিয়ামতের দিন কারো পক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারবে না, আর না সুপারিশ করতে পারবে।
- মুসলিম শরীফ

হযরত আশেকে ইলাহী বুলন্দ শহরী "অভিশাপ দেয়া বদ স্বভাব" শিরোনামে এতটুকু উল্লেখ করেছেন। আর বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ও প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নববী (রাঃ) রিয়াযুস সালিহীন" নামক গ্রন্থে শিরোনাম বেধেছেন "নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বা কোন পশুকে অভিশাপ দেয়া হারাম।" এই শিরোনামের মাধ্যমে অভিশাপের নিন্দা ও নিষিদ্ধতায় তিনি বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করেছেন। আমল ও হিদায়াতের নিয়্যতে

পাঠক/পাঠিকা সমাজের সমীপে উপস্থাপন করছি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে আমল করার তাউফীক দিন।

অভিশাপ দেয়ার নিন্দায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ আবু যায়েদ ইবনে সাবেত ইবনে দাহাক আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বাই'আতে রিযওয়ান নামক মহান শপথ অনুষ্ঠানে অংশীদার ছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ইসলাম ছাড়া অন্য মিল্লাত বা ধর্মের শপথ করে (বলে যে, সে যদি এরূপ করে, তবে সে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান), তবে সে ঐ রকমই। কোন ব্যক্তি যে জিনিষ দিয়ে আত্মহত্যা করবে, তাকে কিয়ামতের দিন ঐ জিনিষ দিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। মানুষ যে জিনিসের মালিক নয়, তাতে তার কোন মান্নত হয় না। মুমিন ব্যক্তিকে অভিশাপ বা লানত দেয়া হত্যা করার সমতুল্য।

এই বিষয় ভিত্তিক একটি হাদীস ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন ঃ আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সত্যবাদী মুমিনের জন্য এটা শোভা পায় না যে, সে অত্যধিক অভিসম্পাতকারী হবে।

এ বিষয়ভিত্তিক একটি হাদীস ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন ব্যক্তি কখনও ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী এবং অসদাচারী হতে পারে না।

মুসলিম শরীফে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে অভিশাপে কত বড় সর্বগ্রাসী, সর্বনাশী তার বর্ণনা স্থান পেয়েছে। হাদীসটি পেশ করা হচ্ছে।

ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। (আমরাও তার সাথে ছিলাম)। এক আনসার মহিলা উটটিকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হাকাচ্ছিল আর অভিশাপ দিচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ তার কথা শুনে বলছিলেন ঃ উটের পিঠের সামান পত্র নামিয়ে এটিকে ছেড়ে দাও। কেননা, এখন এটি অভিশপ্ত। ইমরান বলেন ঃ আমি এখনও যেন উটটিকে দেখতে পাচ্ছি। তা

লোকজনের মাঝে চরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেউ তার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে না। তবে যারা দুস্কৃতিকারীদের, জালেম, ফাসেক ও অন্যায়কারীর নাম-ঠিকানা উল্লেখ না করে অভিশাপ দেয়া তবে তা হারাম নয় বরং বৈধ। একথার প্রমাণ আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানতে পাই। সূরা হুদের ১৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "আল্লাহ সম্পর্কে যে মিথ্যা রচনা করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে। এসব লোককে তাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত করা হবে, আর সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিবে এই বলে যে এসব লোকেরাই তাদের প্রভুর নামে মিথ্যারোপ করেছে। শুনে রাখ, জালেমদের আল্লাহর অভিশাপ।"

সূরা আরাফের ৪৪নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ জান্নাতের বাসিন্দারা জাহান্নামীদের ডেকে বলবে ঃ "আমাদের রব যেসব ওয়াদা আমাদের সাথে করেছিলেন, তা আমরা ঠিক ঠিক পেয়েছি। তোমাদের রব যে সব ওয়াদা তোমাদের সাথে করেছিলেন, তা কি তোমরা ঠিক ঠিক পেয়েছ? তারা বলবে হ্যাঁ, তখন একজন ঘোষণাকারী তাদের মাঝে এ কথা ঘোষণা করবে যে, জালেমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন ঃ বিশুদ্ধ হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে সব নারী পরচুলা লাগিয়ে নিজেদের চুল লম্বা করে এবং যারা ঐ কাজ করে দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহর লানত। নবী (সাঃ) আরো বলেছেন ঃ আল্লাহ সুদখোরদের অভিশাপ করেছেন। তিনি (নবী) জীব-জন্তুর ছবি নির্মাণকারীদের লানত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যারা জমির সীমানা অবৈধভাবে পরিবর্তন করে তাদের প্রতি আল্লাহর লানত। যে ডিম চুরি করে, যে আপন পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয় বা অভিশাপ দেয়, যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে জবাই করে, এদের সবার প্রতি আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ায় শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের প্রচলন করে এবং যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতী কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয়; তাদের প্রতি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা এবং সমস্ত মানুষ অভিসম্পাত করেন। তিনি এ বলে বদদু'আ করেছেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি অভিশাপ বর্ষণ কর রোল, যাকওয়ান ও উসাইযার গোত্রের উপর। কেননা, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। রেঅল, যাকওয়ান, উসাইয়া আরবের তিনটি

গোত্রের নাম। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের অভিশাপ করেছেন। যে সব পুরুষ নারীর সাজে সজ্জিত হয়, এবং যে সব নারী পুরুষের বেশে সজ্জিত হয়, তাদেরকে নবী (সাঃ) অভিশাপ করেছেন। উল্লেখিত সব কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এর কতক সহীহ বুখারী এবং কতক সহীহ মুসলিম আর কতক উভয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আমি এখানে শুধু সংক্ষিপ্ত ভাবে ইংগিত করেছি।

যেমনিভাবে একজন মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া নিষেধ তেমনিভাবে একজনকে অন্যায়ভাবে কাফের বা ফাসেক বলা নিষেধ। এ বিষয় ভিত্তিক একটি হাদীস বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে যেন ফাসেক অথবা কাফের না বলে। কেননা, সে যদি প্রকৃতই তা না হয়ে থাকে, তবে এই অপবাদ তার নিজের ঘাড়ে এস চাপে।

পূর্বে উল্লেখিত "অভিশাপ দেয়া বদ স্বভাব" শিরোনামে হযরত বুলন্দ শহরী (রঃ) কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীসে নারীদের দোযখে যাওয়ার এটিও একটি কারণ বলা হয়েছে যে, তারা স্বামীর বড় নাশুকরী করে। স্বামীর অনুগ্রহ, উপার্জন, কষ্ট-ক্লেশ, আদর-সোহাগ কোন কিছুরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় না। হাদীস শরীফে এর ব্যাখ্যা এরূপ বর্ণিত হয়েছে, যদি তুমি কোন নারীর প্রতি দীর্ঘ দিন (যুগ যুগ) ধরে অনুগ্রহ কর, অতঃপর তোমার নিকট থেকে সামান্য কিছু (অভাব-অনটন, ভুল, ক্রুটি, মন্দ আচরণ) দেখতে পেল, তো (অতীতের সকল অনুগ্রহ ও সুব্যবহারের কথা ভুলে যাবে এবং) বলবে, আমি তোমার নিকট (এসে বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে) কখনও কোন মঙ্গলজনক কিছু দেখিনি। —বুখারী, মুসলিম

বস্তুত ঃ হুজুরে আকরাম (সাঃ) নারী জাতির মেজাজ, মজ্জাগত অভ্যাস, সহজাত স্বভাব ও অভ্যন্তরীণ চরিত্রের সঠিক চিত্রায়ন করেছেন। বলাই বাহুল্য, অধিকাংশ স্ত্রী স্বীয় স্বামীদের সাথে এমনই আচরণ করে এবং নিজেকে বিরাঙ্গীনী জ্ঞান করে। স্বামীর মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রয়োজন তখন উপলদ্ধি করে, যখন উপলদ্ধি করে কোন উপকার হয় না। কারণ, প্রাণপ্রিয় স্বামী তার পরকালের যাত্রী হয়ে আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছে।

স্ত্রীর জিদ জ্ঞানীগুণী স্বামীকেও বোকা বানিয়ে দেয়

জ্ঞানের আধার, রহমতের কান্ডার, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নারী সমাজের আরো একটি সহজাত স্বভাবের পর্যালোচনা করেছেন। আর তা হল, কোন কোন জিদ্দি ও গোঁয়ার প্রকৃতির নারী জ্ঞানী-গুণী, বিবেকবান শিক্ষিত স্বামীকেও বুদ্ধু ও বোকা বানিয়ে ছাড়ে। জিদ করে করে, একই কথা বার বার বলে বলে স্বামী কান ভারী করে তোলে এবং ভাল শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বিবেকবান, জ্ঞানী-গুণী স্বামীকে নির্বোধ, বেকুফ বানিয়ে ফেলে। যেমন-স্বামীকে বলে, তোমার আয়-উপার্জন কম। এত অল্প আয়ে সংসারের ব্যয়ভার বহন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটি সুন্দর বুদ্ধি আছে। মা-বাপ থেকে পৃথক হয়ে যাও। তখন দেখবে, আমাদের সংসার কেমন সচ্ছলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মাতা-পিতার অনুগত সোনার ছেলে, আদরের দুলাল প্রথম প্রথম কিছুদিন সন্ত্রাসী, কুটনী স্ত্রীর কথায় ভ্রুক্ষেপ করে না বটে, কিন্তু সর্বনাশী স্ত্রী তাকে প্রতিরাত্রে বলতে বলতে, ছবক শিখাতে শিখাতে বাধ্য করে মাতা-পিতা থেকে পৃথক হতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে কালসাপ, পাষানী স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে অবশেষে মাতা-পিতার সংসার থেকে পৃথক হয়েই যায়। যে ব্যক্তি বড় বড় মিল-কারখানা, ইন্ডাস্ট্রীজ পরিচালনা করে, শত শত অফিসারদের নেতৃত্ব দান করে, সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে ডিজি, এম.জি পদে দায়িত্ব পালন করে বরং মন্ত্রী-মিনিষ্টারের পদে অধিষ্ঠিত, সেও এতবড় শিক্ষিত ও জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর ইচ্ছার দাসত্ব করতে কেন যেন বাধ্য হয়েই যায়। লক্ষীখোকার মত স্ত্রীর শেখানো সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলে, স্ত্রীর তালে তাল মিলিয়ে সংসার ধর্ম পালন করে। স্ত্রী যখন যে টোপ ফেলে, তাই গিলে খায়। তার সকল শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রতাপ, প্রভাব স্ত্রী সম্মুখে মূল্যহীন, তুচ্ছ হয়ে যায়। হায় আফসোস! সেনা বাহিনীর এত বড় মেজর জেনারেল স্ত্রীর সম্মুখে ভিজে বেড়াল সেজে চুপ-চাপ লক্ষীসোনার মত বসে থাকে।

অলংকার ও পোশাকাদির ব্যাপারে স্বামীকে বাধ্য করে নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নেয়। মহল্লার কোন গৃহিণী নতুন ডিজাইনের কোন অলংকার যদি তৈরী করে, তাহলে আর স্বামী বেচারার রক্ষা নেই। এখনই বানিয়ে দিতে হবে, আজই অর্ডার দিতে হবে। স্বামী বলে, এখন অলংকার বানানোর সুযোগ নেই। বাজার মন্দা, ব্যবসা বেশী একটা ভাল যাচ্ছে ন। বেতন

অল্প, আগের থেকেই ঋণ রয়েছে মাথায়। ব্যাস্! সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল কামান। মুখ থেকে বের হতে থাকল মেশিন গানের গুলি। ভাগ্যাকাশে বইতে থাকল দুর্ব্যবহারের ঝড়ো হাওয়া। স্ত্রী ডাইনীর মত চোখ বড় বড় করে হুংকার দিয়ে বলে উঠল, তুমি আমার কোন কথা রেখেছ? আমার কোন দাবী তুমি পূর্ণ করেছ? তুমি সব সময় বাহানা তালাশ কর। কি প্রয়োজন ছিল একজন নিরীহ মেয়ের জীবন নষ্ট করার। হালাল উপার্জন করতে পারিসনা, তো হারাম কামাই কর। প্রথমে "তুমি" "তুমি" অতঃপর ঝড়ের গর্তি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে "তুই" "তুই" শুরু হয়ে যায়।

প্রথম ধাক্কায় স্বামী নিরব, নিস্তবদ্ধ হয়ে চুপসে যায়। অফিস থেকে যখন রাত্রে বাড়ি ফিরল তখন পূনরায় ইনিয়ে বিনিয়ে, মিনমিনিয়ে স্বামীর কর্ণযুগল ফাপিয়ে তুলতে লাগল। স্বামী তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। শিশির ভেজা ভোর-সকালে স্বামী যখন কর্মস্থলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন স্ত্রী ভাবল, গরমে ভয় পেলনা, শরমে নত হল না, এবার দেখি, নরমে হৃদয় গলে কি-না। তাই সুযোগ বুঝে স্বামীর পা যুগল জড়িয়ে ধরে মায়াকান্না জুড়ে দিয়ে বলল, তোমার পায়ে পড়ি, দয়া করে আজ যেখান থেকে সম্ভব আমার জন্য টাকা যোগাড় করে আনবেই। আজ অলংকারের টাকা আমার চাই। স্বামী বেচারা স্ত্রীর বেহাল অবস্থা দেখে স্ত্রীর মায়ায় বিগলিত হয়ে বলল, আজকে আমি কোত্থেকে টাকা আনব? ডাকাতী করব, না হাইজ্যাক করব? উত্তর এল, আমি ও সব কিছু জানিনা। ডাকাতী করবে না অন্য পন্থা অবলম্বন করবে, তুমিই জান। অলংকারের টাকা আমি চাই। স্বামী বলল, আমার তো ঘুষ গ্রহণ করারও বদ অভ্যাস নেই। হারাম উপাজনের কোন পন্থাও আমার জনা নেই। আর কারো থেকে ধার-উধার পাওয়ারও কোন আশা নেই। কেঁদে কেঁদে স্ত্রী বলে, সারা দুনিয়ার সবাই ঘুষ খায়, আর তুমি মত্তাকী, পরহেযগার সেজে বসে আছ। কোথাও বেড়াতে যেতে পারিনা, পাড়া-প্রতিবেশী দু'চারজন মহিলার সাথে মিশতেও পারি না। না হাতে চুড়ি আছে, না গলায় লকেট।

স্বামী বেচারা কি আর করবে? জল্লাদী স্ত্রীর কথাগুলো মনের গভীরে নিয়ে চিন্তা করে। স্ত্রী আমার ডাইনী হোক, পাষাণী হোক, আর কুটনী হোক অবশেষে স্ত্রী তো আমারই। সে আমার সংসারে এসে মোটা কাপড় মোটা ভাত ছাড়া আর কিছুই তো পায়নি। এ আবদারটা রক্ষা না করলে

তার কচি মনটা ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাবে। আর মন ভাঙ্গা আর মসজিদ ভাঙ্গা সমান কথা। তাই সতী স্ত্রীর নিষ্পাপ হৃদয়টা ভাঙ্গার হাত থেকে রক্ষাকল্পে কোন একটা পন্থা অবশ্যই অবলম্বন করেতে হবে। পরিশেষে পন্থা অবলম্বন করেই একটা জয়ের মাল্য স্ত্রীর গলায় শোভা পায়। জিদ করে হোক আর পায়ে পড়ে হোক স্বামীকে পাপে ডুবিয়ে, বোকা ও বুদ্ধ বানিয়ে অলংকার বানিয়েই ছাড়ে।

পোশাক তৈরীর ক্ষেত্রেও একই পন্থা অবলম্বন করে। যদি কোন নতুন কাপড়, নতুন ডিজাইন বা নতুন ফ্যাশন বাজারে উঠল, ব্যাস্! স্বামীর রক্ষা নেই। হুবহু ঐ ডিজাইনের পোশাক তৈরী করে দিতেই হবে। স্বামীর নিকট টাকা থাকুক বা না থাকুক, সময়-সুযোগ আছে বা না আছে, ঐ পোশাকের জন্য জিদ শুরু করে দেয়। ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে-কেটে বানিয়েই ছাড়বে।

সবচে' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিবাহ-শাদীতে যে কাপড় একবার পরিধান করেছে ঐ কাপড় পরিধান করে অন্য কোন্ অনুষ্ঠানে যাওয়া বড় দোষণীয়। তাই অনুষ্ঠানের প্রতিদিন নতুন জোড়া চাই। ডিজাইনও নতুন, ফ্যাশনও নতুন, ছিটও নতুন, ফিটও নতুন, দেখতে যেন মডার্ণ মনে হয়। এ সব চিন্তাভাবনায় স্ত্রী সর্বদা ডুবে থাকে। আর তার এই অনৈসলামিক খাহেশাত পূর্ণ করতে যেয়ে অসংখ্য গুনাহ তার দ্বারা প্রকাশ পায়, অসংখ্য গুনাহ স্বামীর দ্বারা প্রকাশ পায়। স্বামী তার পাপিষ্ঠা স্ত্রীর খাহেশাত পূর্ণ করার টাকা জোগাড় করতে যেয়ে অক্ষমতার সম্মুখীন হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে ঘুষ গ্রহণ করে অথবা মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করে অধিক টাকা উপার্জন করে, যার কারণে স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘুষ গ্রহণ করা হারাম এবং একাজ মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। এবং মাত্রাতিরিক্ত মেহনত করলে স্বাস্থ্য রোগাগ্রস্ত হয়ে যায়। এত সব জানার পরও সভ্রান্ত পরিবারের ভাল, ভদ্র, শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিও স্ত্রীর সম্মুখে বোকা ও বুদ্ধু বনে যায় এবং স্ত্রীর জিদ ও হারাম আবদার পূর্ণ করার জন্য হারাম পন্থা অবলম্বন করতেও পরওয়া করে না।

মহিলাদের জন্য অলংকার পরিধান করা জায়েয তো অবশ্যই, কিন্তু ঐ জায়েয কাজের জন্য টানাহেচড়া করা এবং স্বামীর জীবনের উপর ঋণের বোঝা টাপিয়ে দেয়া, এ জন্য তাকে ঘুষ ইত্যাদি হারাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা, অতঃপর বেগানা পুরুষদের সম্মুখে প্রদর্শনীর জন্য পোজ দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু অবকাশ ও বৈধতা রয়েছে?

বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠানে এই নারী সমাজ অসংখ্য শরীয়ত পরিপন্থী প্রথার প্রচলন জারী রেখেছে। এরাই চালু করেছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কুরসম। ঐ কুপ্রথার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। পুরুষ যত বড় দ্বীনদার, আমানতদার, দিয়ানতদার হোক না কেন, তাদের একটি কথারও মূল্যায়ন করা হয় না ঐ অনুষ্ঠান। অবশেষে ওটাই হয়, যেটা নারীরা চায়। নারীদের ইচ্ছানুযায়ীই অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। পুরুষরা শুধু হুকুমের দাসরূপে অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপভোগ করে।

জীবন-মরণের ক্ষেত্রেও মহিলারা বিভিন্ন প্রকার বেদআত ও শিরকযুক্ত বদরসম আবিষ্কার করেছে। ওগুলো পালন করা নামায, রোজার থেকেও বেশী আবশ্যক ও জরুরী মনে করে। স্বামী যদি বুঝানোর চেষ্টা করে যে, এগুলো কুরআন, হাদীস দ্বারা প্রামণিত নয়, এগুলো পরিত্যাগ কর, তো এক জনও ঐ উপদেশ শ্রবণ করতে রাজী নয়। পরিশেষে, স্বামী বাধ্য হয়েই বেদআত ও শিরক ভরা অনুষ্ঠানের পূর্ণ খরচ ও ব্যয়ভার বহন করতে সম্মত হয়।

এসব উপমা ও দৃষ্টান্ত আমি হাদীস শরীফের মর্মার্থ সুস্পষ্ট করার জন্য লিপিবদ্ধ করলাম। ধর্মকর্মে ও বিবেক-বুদ্ধিতে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ছলনাময়ী নারীগণ বড় বড় শিক্ষিত, বুদ্ধিমান পুরুষকে বুদ্ধু ও বোকা বানিয়ে ছাড়ে, নবীজীর (সাঃ) কথাটা বাস্তব সত্য।

নারী ধর্মকর্ম ও বিবেক বুদ্ধিতে দুর্বল (কম) কিরূপে?

পূর্বোল্লেখিত হাদীস শরীফের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে যে, মহিলাগণ যখন নবীজী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করল যে, আমাদের দ্বীন ও বিবেক কম কি হিসেবে। নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, বিবেক-বুদ্ধি কম সে তো একথা দ্বারাই বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত দু'জন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সমমান গণ্য করেছে। যেমন ঃ মহা গ্রন্থ আল-কুরআনে (সমস্ত রহস্যের মালিক, বিশ্ববিধাতা, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষা কর্তা) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

অতঃপর সাক্ষীদ্বয় যদি পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ এবং দু'জন নারী এমন সাক্ষীদের মধ্যে থেকে হবে, যাদের প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট হও। যদি একজন ভুলে যায়, তাহলে অন্য জন যেন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। -সূরা বাকারাহ, আঃ ২৮২

নারীরা ধর্মকর্মে কম এভাবে যে, প্রতি মাসে বিশেষ কতক দিনে তারা নামায, রোযার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা ঐ দিনসমূহে না নামায পড়তে পারে, না রোযা রাখতে পারে। (অবশ্য রমযান মাসে এদিনগুলো এসে পড়লে রোযা ছেড়ে দেবে, কিন্তু পরে কাযা করতে হবে)

একথা শ্রবণ করে হয়ত কোন উৎসুক মহিলা প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এতে আমাদের কি অন্যায়? বিশেষ দিনসমূহে অপারগতা প্রাকৃতিক এবং স্বয়ং শরীয়ত ঐ দিনসমূহে নামায, রোযা আদায় করতে নিষেধ করেছে।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, অপারগতা যদিও প্রাকৃতিক ও স্বভাবগত এবং ইসলামী শরীয়তও ঐ দিনসমূহে নামায, রোযা আদায় করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু এ কথাও বাস্তব সত্য ও লক্ষ্যনীয় যে, ঐ দিনসমূহে নামায, রোযা আদায়ের যে বিশাল বরকত ও সাওয়াব, মহিলাগণ তা থেকে বঞ্চিত থাকে। প্রাকৃতিক ও কুদরতী অপারগতার কারণেই তো শরীয়তের বিধান এই যে, ঐ দিনসমূহে নামায একেবারেই মাফ করে দেয়া হয়েছে, যার কাযা করা লাগবেই না। অবশ্য রমযানের রোযা কাযা করতে হবে।

এখন কোন মহিলা যদি প্রশ্ন তোলে যে, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা কুদরতী এই অপারগতা ও অসুবিধা নারী জাতিকে কেন দিলেন? উত্তরে আমি বলব, এ জাতিয় প্রশ্ন আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ্ম রহস্য এবং তাঁর কুদরত ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের শামিল। এটা ঐ কথার মতই যে, আল্লাহর যে বান্দা হজ্জ আদায় করবে, সে হজ্জ করার সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর যে হজ্জ করবে না, সে হজ্জের সাওয়াব পাবে না। এখন যার নিকট হজ্জ আদায় করার টাকা-পয়সা নেই, সে যদি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে যে, আল্লাহ আমাকে কেন হজ্জ আদায় করার পয়সা দিল না? যদি কেউ এমন বলে, তাহলে তা হবে তার অজ্ঞতা ও মূর্খতার দলীল। এ সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে অসংখ্য রহস্যের অধিকারী মহা মহিম আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

তোমরা এমন কোন জিনিষের আকাংখা করোনা, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা তোমাদের একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। -সূরা নিসা

আদর্শ স্ত্রীর যা করণীয় ও বর্জনীয়

একটি সুন্দর পরিপাটি সংসার উপহার দিতে, একটি ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবার গড়তে, একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি রক্ষার্থে, স্বীয় সম্ভ্রম, মান-ইজ্জত, মর্যাদা ও অধিকার সমুন্নত রাখতে, কুরআনী বিধি-বিধান ও মহানবী (সাঃ)-এর প্রদর্শিত নূরানী তরীকায় জীবন-যাপন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতা অর্জনের নিমিত্ত পুরুষের মত নারীরও বেশ কিছু করণীয় ও বর্জনীয় কাজ রয়েছে।

ঈমান, নামায, রোযা ও অন্যান্য ফরয আমলের মত আদর্শ স্ত্রীর কার্যসমূহের মধ্যে রয়েছে-কুরআন-হাদীস নির্দেশিত পর্দার বিধান মেনে চলা এবং পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা- যাতে কোন অপরিচিত দূর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার উদ্রেক না করে, বরং তার নিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে।

আদর্শ স্ত্রীকে এ বাস্তব সত্যটিকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, পর্দা প্রথা নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার হরণের জন্য নয়, বরং পর্দা প্রথা সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে, দুর্বলমনা পুরুষদের কুদৃষ্টি থেকে নারীকে রক্ষার জন্য এবং শালীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য। পর্দা প্রথা যদি নারী জাতির প্রতি জুলুম ও অবিচার হত, তাহলে দয়াময়, করুণাময়, রাহমান, রাহীম মহান আল্লাহ তা'আলা কস্মিনকালেও পর্দা ফরয করতেন না। আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। সেই মহান প্রজ্ঞাময়ের আদেশ-নির্দেশ কখনও অকল্যাণকর হতে পারে না। নারী জাতির প্রভুত কল্যাণ ও মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি পর্দার বিধান জারী করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন ঃ

"হে নবী! আপনি স্বীয় পত্নীগণকে, কন্যাগণকে ও মুমিন স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে (সম্ভ্রান্ত রমণী বলে) চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"-সূরাহ আল-আযহাব, ৫৯

সূরাহ আহযাবে অপর একটি আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

(হে নারীকুল!) তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যগণ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।"

-সূরাহ আল-আহযাব, ৩৩

এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে মহানবী (সাঃ)-এর পূণ্যাত্মা স্ত্রীগণকে পর্দা বিধান পালন করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। অথচ তাদের অন্তরকে পূত পবিত্র, নিষ্পাপ রাখার দায়-দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে যে সব পুরুষকে সম্বোধন করে পর্দার বিধান প্রদান করা হয়েছে, তাঁরা হলেন নবীজীর (সাঃ) হাতে গড়া সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)। তাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন, যারা মর্যাদার দিক দিয়ে ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে। তথাপি তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য নারী ও পুরুষের মাঝে পর্দা প্রথার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ এমন নারী কে আছে, যে তার অন্তরকে নবীজীর (সাঃ) পূণ্যাত্মা স্ত্রীগণের অন্তরের চেয়েও অধিক পবিত্র হওয়ার দাবী করতে পারে? যদি কেউ দাবী করে, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, "সে বোকার স্বর্গে বাস করে।"

বেপর্দা চলাফেরার একটি ক্ষতিকারক দিক হল এই যে, শয়তান তার উপর কু-নযরে দৃষ্টিপাত করে-যদ্বারা সে নিজে পাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং অপরকেও তাতে লিপ্ত করে তার সর্বনাশ করে।

তিরমিযী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুরে আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করেন, "নারী জাতির আপদমস্তক (আবরণীয়) ছতর। যখন সে বেপর্দায় বাহিরে বের হয়, তখন শয়তান তাকে (কামনার দৃষ্টিতে) দেখতে থাকে।"

-তিরমিযী শরীফ

বেগানা মহিলাদের দিকে তাকানো যেমন পুরুষদের জন্য হারাম, তেমনিভাবে পুরুষদের দিকে তাকানো মহিলাদের জন্য হারাম; চাই পুরুষ

লোক অন্ধই হোক না কেন। এ সম্পর্কে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিথ হয়েছে ঃ

একদা তিনি ও হযরত মায়মুনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছিলেন ঃ হঠাৎ হযরত ইব্‌নু উম্মে মাকতুম তাঁর নিকট এসে পৌছলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা পর্দা কর! আমি বললামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে কি অন্ধ নয়? সে তো আমাদের দেখছেন না। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কি অন্ধ যে, তাকে দেখতেছ না?

- আমহদ, তিরমিজী ও আবু দাউদ

যে সমস্ত নারীরা বিপর্দা, বেহায়া ও নির্লজ্জের মত চলাফেরা করে এবং পুরুষদের ঈমান আমল ধ্বংস করে, তাদের ন্যায় ক্ষতিকারীনী নারীদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আমার অনুপস্থিতিতে আমি পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ফিতনা ও বিপর্যয় রেখে যাইনি।"-বুখারী ও মুসলিম

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, সাংসারিক, পারিবারিক, সামাজিক, মানসিক সুখ-শান্তির জন্য পর্দা প্রথার বিকল্প নেই।

বিউটি পার্লারে যাওয়া হারাম কেন?

বর্তমানে আমাদের দেশে ইউরোপীয় দেশসমূহের অন্ধ অনুকরণে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য বিউটি পার্লার গজে উঠেছে। যার মধ্যে নারী কর্তৃক পুরুষ দেহ ম্যাসেজ, দেহ ব্যবসাসহ বিভিন্ন প্রকার হারাম ও অসামাজিক কার্যকল্প সংঘটিত হয়ে থাকে। সেখানকার অন্যান্য গর্হিত কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে-

(ক) নববধুর শ্রী বৃদ্ধি ও রূপ চর্চার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে কপাল বা ভ্রুর চুল উপড়িয়ে ফেলে ভ্রু সরু করা হয়।

(খ) স্বল্প কেশী নববধূ ও রমণীদের খোপার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য, খোপা বড় দেখানোর জন্য অথবা লোক সমাজে কেশবতী, সুকেশা হিসেবে

পরিচিতি লাভ করার জন্য মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করা হয় বা করানো হয়।

(গ) রূপবতী হওয়ার আকাংখায় মহিলাদের মাথার চুল ছেটে চুলকে ববকাটিং ইত্যাদি করা হয়।

(ঘ) নিজের পরিচিতির জন্য অথবা স্মৃতি হিসাবে শরীরে কিংবা হাতে কারো নামের উল্‌কী করার ব্যবস্থা করা হয়।

তাই প্রতিটি মুসিলম নারীর কর্তব্য এই যে, তারা এ জাতিয় হারাম কর্মসমূহ পরিত্যাগ করবে।

কপাল বা ভ্রুর চুল উপড়িয়ে ফেলার নিষিদ্ধতায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন-

"আল্লাহ তা'আলা লা'নত (অভিশাপ) করেন এমন সব নারীর উপর, যারা অপরের অঙ্গে উল্‌কি করে অথবা নিজের অঙ্গেও করায়, যারা কপাল বা ভ্রুর চুল উপড়িয়ে ফেলে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত সরু ও তার ফাঁক বড় করে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে।"-বুখারী ও মুসলিম

নারীদের নিজের মাথায় বা অন্যের মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করার নিষিদ্ধতায় আবু দাউদ শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন-

সেই নারীর উপর অভিশাপ, যে অন্যের মাথার কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে এবং যে নিজের মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায় এবং যে অন্য নারীর ভ্রুর চুল উপড়ায় অথবা নিজের ভ্রুর চুল উপড়ায়।" - আবু দাউদ শরীফ

মহিলাদের মাথা নেড়ে করা বা ফ্যাশন স্বরূপ চুল ছেটে ছোট করা নিষেধ। মহিলাদের মাথার চুল পুরুষদের দাড়ির মতই সৌন্দর্য বন্ধক ও নারীত্বের পরিচায়ক। সুতরাং ফিকাহবিদগণের মতে মহিলাদের মাথার চুল মুড়ানো ব বিনা প্রয়োজনে কাটা জায়িয নয়। এ সম্পর্কে একটি হাদীস. বর্ণিত হয়েছে-

"হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী (সাঃ) মহিলাদের মাথা মুড়াতে নিষেধ করেছেন।" -নাসায়ী

শরীরে উলকী করার নিষিদ্ধতায় বুখারী শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

"হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বদ নযর লাগা সত্য" এবং "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে উমর হতে অপর একটি হাদীস বর্ণিহ হয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন-

"সেই নারীর উপর আল্লাহর অভিশাপ, যে নারী অন্য নারীর মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে কিংবা নিজ মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করায় এবং যে অন্যের শরীরে উল্কি করে অথবা নিজের শরীরে উলকি করায়।"

হাদীস শরীফে এমন পাতলা কাপড় পরিধান করতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, যদ্বারা শরীরের কোন অঙ্গ পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। যেমন- আবু দাউদ শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা (আমার ভগ্নি) আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট গেলেন। হুজুর (সাঃ) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে আসমা! মেয়েরা যখন বালিগা হয়, তখন তার শরীরের কোন অঙ্গ প্রকাশ পাওয়া সমীচীন নয়। তবে কেবল মাত্র এটা, এই বলে তিনি মুখ এবং হাতুলীর দিকে ইঙ্গিত করলেন। (মুখ ও হাতের তালু নামাযে সতেরের অন্তর্ভূক্ত নয়। কিন্তু পরপুরুষ হতে সর্বাবস্থায়ই মুখ ও হাতের তালু ঢাকতে হবে।

এ বিষয় ভিত্তিক একটি হাদীস ইমাম মালেক (রাঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থ ম'আত্তা মালেকে বর্ণনা করেছেন-

হযরত আলকামা ইবনে আবু আলকামা তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ একদা হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান একখানা খুব পাতলা উড়না পপরিহিত অবস্থায় হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তখন হযরত আয়িশা (রাঃ) উক্ত পাতলা উড়নাখানা ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে একটা মোটা উড়না পরিয়ে দিলেন।"

ইমাম মুসলিম পাতলা মিহি কাপড় পরিধানের কু-পরিণতি সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন,

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "দোযখীদের এমন দু'টি দল রয়েছে, যাদের আমি দেখিনি। তাদের একদলের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে। তারা তা দিয়ে লোকদের মারবে। আর এক দল হবে নারীদের। তাদেরকে পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ দেখাবে। গর্বের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথ চলবে। বুখতী উটের উঁচু কুঁজের মত করে খোঁপা বাঁধবে। এসব নারী কখনও জান্নাত লাভ কররে না, জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।

বর্তমানে ইয়াহুদী, নাসারা, বৌদ্ধ্য, হিন্দু, মুশরিক ও নাস্তিক-মুরতাদদের নারীদের কথা দূরে থাক, মুসলিম পরিবারের মুসলিম নারীদের ধর্মীয় ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের কথা শুনলে লজ্জায় মাথা হেট হয়ে যায়। উপরোল্লেখিত হারাম কার্যসমূহ হতে একটাতেও তারা ইউরোপিয়ান নারীদের থেকে পিছিয়ে নেই। নারী স্বাধীনতা ও নারীর অধিকার আদায়ের নামে চরম বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা ও ধর্মহীনতা আজ নারীদের মধ্যে বিরাজমান। হিতে বিপরিত হয়ে আজ সম্মানিতা মায়ের জাতি পথে ঘাটে, স্কুলে-কলেজে, খেলা-ধূলা ও শরীর চর্চার নামে মাঠে-ময়দানে, সাঁতার প্রতিযোগিতার নামে সুইমিংপুলে, চাকররী-বাকরী ও আর্থিক সনির্ভরতার নামে অফিস-আদালতে, গার্মেন্টসে এবং যাত্রা-থিয়েটার, সিনেমা, মডেলিং ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে যা কিছু করছে, তাতে তারা লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা, অপমানিতা ও ধর্ষিতা হওয়া ছাড়া আর কি বা পাচ্ছে? আর এভাবেই তারা ইসলাম প্রদত্ব মান-সম্মান ও ইজ্জতকে ভূলুণ্ঠিত করছে। অথচ ন্যায়, শান্তি ও মুক্তির ধর্ম শাশ্বত ইসলাম সম্মানিতা মাতৃজাতিকে যে মান-সম্মান, মর্যাদা, ইজ্জত, ফযীলত ও অধিকার দিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে এর এক আনাও দেয়নি। ইসলাম নারী জাতিকে কতটুকু মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে, তার যৎ সামান্য আলোচনা সম্মানিত পাঠক/পাঠিকার সম্মুখে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করছি।

মুসলিম নারীর সম্মান ও মর্যাদা

মহানবীর (সাঃ) আবির্ভাব তথা ইসলাম ধর্মের আর্বিভাবের পূর্বে অন্ধকারাচ্ছন্ন অজ্ঞতার যুগে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিশেষ করে আরব ভূ-খন্ডে উপপত্নী, গণিকাবৃত্তি, দাসত্বের বেড়াজাল সহ নারীর উপর চলত অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন ও পাশবিক নিপীড়নের ঘৃণ্য ষ্টিমরোলার। বস্তুত ঃ সেই জাহিলিয়্যাতের যুগে স্ত্রী তথা নারীজাতি উপপত্নীত্ব ও ও গানিকাবৃত্তি সহ

যে সকল ভয়ঙ্কর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল, তা থেকে তাদের মুক্তির কোন পথ বা সুযোগই ছিল না। প্রিয় নবীজী (সাঃ) আবির্ভূত হয়ে তাদেরকে সেই গ্লানীময় জীবন থেকে উদ্ধার করলেন, সমাসীন করলেন সম্মানের আসনে। ইসলামের শেষ নবী, মানবজাতির হিদায়েতের আলোকবর্তীকা, সরওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের সকল অনাচার-অত্যাচার, জুলুম-অবিচার, নারীর উপর অমানুষিক নির্যাতনকে সমূলে বিনাশ সাধন করেন এবং সকল প্রকার ঘৃণ্য ও অশ্লীল প্রথাকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেন। জাহিলিয়্যাতের যুগে যে নারীর সামাজিক কোন মর্যাদাই ছিল না, একটা তৃণ লতার মূল্য ছিল, কিন্তু একজন নারীর মূল্য ছিল না। সেই নারীকে ইসলাম দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা, ইজ্জত, অধিকার, ক্ষমতা। অধিকন্তু, অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান মর্যাদা দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের চেয়েও অধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কুরআন, হাদীসে এর ভরপুর প্রমাণাদি ও দলীল রয়েছে। মহা পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

"আল্লাহ তা'আলার (কুদরতের) নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের (সুখ-শান্তির) জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জীবন সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"

-সূরা রুম ঃ ২১

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারী জাতির লুপ্ত মর্যাদা, ইজ্জত, সম্মান পুনরুদ্ধারে এক অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয় ঘোষনা দিয়েছেন। তিনি নারী জাতিকে সৃষ্টি করা তাঁর মহান কুদরত ও মহিমার নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদেরকে পুরুষ জাতির সঙ্গিনী বানিয়েছেন। এরপর নারীজাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা তাদের কাছে পৌঁছে সুখ-শান্তি, মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ কর।" মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য 'মনের শান্তি'কে স্থির করেছেন। এটা তখনই

সম্ভবপর, যখন নারী-পুরুষ উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা যথাযথভাবে আদায় করে। আর অধিকার আদায়ের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হবে, যখন নারীর মত পুরুষও নারীর প্রতি প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা, ত্যাগ ও সহমর্মিতার বাস্তব প্রমাণ দেখাবে। পবিত্র কুরআনে নারীর প্রতি মুহাব্বত ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। অথচ নারীর প্রতি প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতা প্রকাশের চিত্র ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে কল্পনাই করা যেত না।

আল্লাহর সৃষ্টি এই নারীজাতি পুরুষদের জন্য শান্তির আধার, সান্ত্বনার উৎস, মুহাব্বত, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। নারীরা মহীয়সী, কল্যাণী। তারা অবহেলা, অবমাননা, লাঞ্ছনা ও ধিক্কারের পাত্রী নয়। নারী ও পুরুষ উভয়ই এক আদম ও হাওয়ার সন্তান। উভয়ের সৃষ্টির উপাদান ও উপকরণ এক ও অভিন্ন। শুধু সত্তা ভিন্ন। তই পুরুষের পক্ষ থেকে নারীকে নারী হওয়ার কারণে অবহেলা করা, অবজ্ঞা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়।

পুরুষ ও নারী জাতিকে একই সূত্রে গ্রথিত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালন কর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনী (হাওয়া [আঃ] কে) সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।" -সূরা নিসা ঃ ১

মহান রাব্বুল আলামীন আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন করেছেন-"হে মানব মন্ডলী" বলে, যাতে সমগ্র মানুষই পুরুষ হোক অথবা মহিলা, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের হোক, অথবা দুনিয়ার প্রলয় দিবস পর্যন্ত জন্ম গ্রহণকারী হোক, সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। স্নেহময়ী, প্রেমময়ী শ্রদ্ধার পাত্রী নারীজাতি যদি অন্ধকার যুগের মত অবহেলা ও অবজ্ঞার জাতি হত, তাহলে মহিমাময় মহান আল্লাহ তা'আলা "হে মানবমন্ডলী" বলে সম্বোধন না করে "হে পুরুষ জাতি" বলে সম্বোধন করতেন।

এছাড়া আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বিশেষ কৌশল ও অনুগ্রহের দ্বারা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতি সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি হতে পারত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন।

আর তা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে তথা হযরত আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরী করে দিয়েছেন। আল্লাহ ভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়াও এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন নারী-পুরুষ একে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে এবং উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব, আশরাফ-আতরাফ, ইতর-ভদ্রের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন সবাই একই মানদন্ডে নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরী করে নেয়। আর আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করার অর্থ হচ্ছে, প্রথমতঃ হযরত আদমের (আঃ) থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই যুগল থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

উল্লেখিত আয়াত থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। নারী জাতি যদি এতই অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্রী হত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কখনও আশরাফুল মাখলুকাত (সৃষ্টির সেরা) হিসেবে পুরুষের মত নারী জাতিকে সৃষ্টি করতেন না।

ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাতের যুগের মত ইসলাম নারী জাতিকে নিছক ভোগের উপকরণ মনে করে না। ঠিক তেমনিভাবে নারী জাতিকে কোন স্বতন্ত্র জাতি মনে করে না। বরং এ কথা মনে করে যে, নারী-পুরুষ উভয়ই মৌলিক ভাবে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। হযরত আদম ও মা হাওয়া (আঃ) হলেন প্রথম মানব-মানবী। এই প্রথম মানব-মানবী থেকেই সব কালের, সব জাতের, সব দেশের তথা বিশ্ববাসী এক আল্লাহর সৃষ্টি। বনী আদম সব সমান। মর্যাদা, মান-সম্মানের দিক দিয়ে নারী-পুরুষ সকলেই সমান। বরং যার আমল ভাল, সেই আল্লাহর নিকট সম্মানিত।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

"হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত (মর্যাদার যোগ্য), যে সর্বাধিক পরহেযগার।" -আল হুজুরাত ঃ১৩

আলোচ্য আয়াত থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, গর্ব ও মান-ইজ্জতের

অধিকারী শুধু মাত্র পুরুষ জাতি-ই হবে, তা নয়; বরং নারী জাতিও মান-সম্মান ও ইজ্জতের অধিকারী হতে পারে! কারণ, আল্লাহর নিকট মান-মর্যাদার অধিকারী হওয়া, সম্ভ্রান্ত হওয়া নির্ভর করে প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও তাকওয়া-পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে, সে-ই আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত ও মর্যাদাবানরূপে গণ্য হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করেন। যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পারে। তাওয়াফ শেষে তিনি এই ভাষন দেন ঃ

"সমস্ত প্রসংশা আল্লাহর, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন (নারী-পুরুষ) সকল মানুষ মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত ঃ (এক) সৎ, পরহেজগার ও আল্লাহর কাছে সম্মানিত, (দুই) পাপাচারী, হতভাগা ও আল্লাহর কাছে লাঞ্ছিত ও অপমনিত।" অতঃপর তিনি (সাঃ) আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করেন। -তিরমিযী শরীফ

উল্লেখিত হাদীস দ্বারাও এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, "সকল মানুষ" বলতে নারী-পুরুষ উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। শুধু পুরুষরাই নেককার, সৎ ও পরহেজগার হবে, আর নারীরা হবে নিকৃষ্ট, তা নয়। যেমন–ইসলাম পূর্ব যুগে নারী জাতিকে মনে করা হত সমস্ত অনর্থের মূল, শয়তানের মন্ত্রণাদাতা ইত্যাদি। বরং সৎ, পরহেজগার ও মর্যাদাবান পুরুষরাও হতে পারে, নারীরাও হতে পারে।

প্রাক-ইসলামী যুগে এবং ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে নারী জাতিকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছে, যেভাবে বিভিন্ন দোষে দোষারোপ করা হয়েছে, যেভাবে তাদের উপর জুলুম- নির্যাতন করা হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শান্তির ধর্ম একমাত্র ইসলাম-ই নারী জাতিকে সঠিক মর্যাদা দান করেছে। পবিত্র কুরআনে নারী জাতির মর্যাদা ও সম্মান বর্ধন স্বরূপ নারীকে পুরুষের আচ্ছাদন বলা হয়েছে, তেমনিভাবে পুরুষকে 'নারীর আচ্ছাদন' বলা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"তারা (নারীগণ) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পুরুষরা) তাদের পরিচ্ছদ।" -আল-বাক্বারাহ ঃ ১৮৭

আলোচন্য আয়াতে মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে

পুরুষের জন্য "পরিচ্ছদ" আখ্যায়িত করেছেন। প্রত্যেক মানব সন্তানই পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে থাকে। আর প্রত্যেকেই চায় যে, তার পরিধানের পোষাকটা একটু দামী, একটু উন্নত হোক। বিশেষ করে যারা একটু সুস্থ বিবেকবান, সৌখিন, তারা কখনও স্বেচ্ছায় ছেঁড়া-ফাটা, দুর্গন্ধময় ময়লা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করবেই না। মূল্যহীন বস্ত্র তারা শরীরে জড়াবেই না। তাই বলতে হয় যে, মায়ের জাতি নারী জাতি যদি মূল্যহীন, অবমাননা ও অবজ্ঞার পাত্রী হত, তাহলে মহা প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে পুরুষ জাতির আচ্ছাদন আখ্যায়িত করতেন না। মাখলুক হিসাবে নারীরা পুরুষদরে মত মর্যাদার অধিকারী বলেই পরস্পরকে পরস্পরের আচ্ছাদন তথা পোশাক বলা হয়েছে।

ধর্মীয় সাফল্যের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে নারী জাতি পুরুষের তুলনায় কোন অংশে কম নয়। অনেক ক্ষেত্রে নেক আমলের বিনিময়ে পুরুষের মত তাদেরকেও জান্নাতের শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে।"

-সূরা আল-মুমিন ঃ ৪০

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, পারলৌকিক প্রশান্তি ও আযাব হতে মুক্তি শুধুমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। বিভীষিকাময় বিচার দিবসের চরম কামিয়াবী ও নাজাতের অধিকারী একমাত্র পরুষকে করা হয়নি এবং নারী জাতিকে হেয় জ্ঞান করে অনন্ত অসীম মহাশান্তির কানন জান্নাতের অধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। বরং আয়াতে বলা হয়েছে, যে নারী হোক বা পুরুষ হোক, যদি ঈমানদার এবং সৎকর্মশীল হয়, তাহলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং বে-হিসাব রিযিক প্রাপ্ত হবে।

ধর্মীয় সাফল্যের মাধ্যমে যেমনিভাবে ইহকাল-পরকালে উজ্জ্বল ভাস্কর হয়ে আছেন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ, তেমনিভাবে শ্রেষ্ঠত্বের খেতাবে ভূষিতা হয়ে আছেন হযরত মারয়াম (আঃ), হযরত খাদীজাতুল কুবরা

(রাঃ), হযরত আয়িশা (রাঃ) প্রমূখ সাহাবিয়াগণ। ধর্মীয় পরিমন্ডলে নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা-ই সমভাবে গ্রহণযোগ্য, প্রশংসনীয় এবং মহান আল্লাহর দরবারে বিনিময় প্রাপ্তির উপযুক্ত। নারী জাতিকে ধর্মে-কর্মে সাফল্যের সুযোগ এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের গ্রহণযোগ্যতা দ্বারা যতটুকু মর্যাদা ইসলাম দিয়েছে, অন্য কোন ধর্মে বা মাতাদর্শে তা দেয়া হয়নি।

জাহিলী যুগের অনুকরণে বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় তথাকথিত কিছু নারী লোভী, যৌনবাদী বুদ্ধিজীবিরা বিভিন্ন প্রকার রসালো ও আকর্ষণীয় শ্লোগানের মাধ্যমে, নারী জাতিকে ঘর থেকে বাইরে এনে 'নারী স্বাধীনতার' নামে যা কিছু করছে, তা নারী স্বাধীনতা নয়, বরং তা 'যৌন স্বাধীনতা' ছাড়া আর কিছু নয়। যে নারী ছিল এক পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী, সে এখন পথে-ঘাটে সবার জন্য সর্বাঙ্গিনী। কারণ, তাকে এখন শুধু এক স্বামীর মন যোগালে চলে না, বরং অফিসের বড় সাহেব এবং গার্মেন্টসের ম্যানেজার ও মালিকের মনও যোগাতে হয়। যে নারীর অঙ্গ ছিল হিজাব ও বোরকা দ্বারা আবৃত, সে নারীকে সাঁতার প্রতিযোগিতার নামে সুইমিং পুলে দু'টুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছুই রাখার অনুমতি দেয়া হয় না। যে নারী চিরজীবনের সঙ্গী প্রাণ প্রিয় স্বামীর সম্মুখে অন্দকারাচ্ছন্ন রাতেও অনাবৃত হতে লজ্জাবোধ করত, সে নারীকে "সুন্দরী প্রতিযোগিতা" ও "অভিনয় শিল্পের" নামে কোটি কোটি পুরুষের সম্মুখে উলঙ্গ করা হচ্ছে। যে কিশোরী বেগানা পরপুরুষ তো দূরের কথা, আপন আত্মীয় স্বজনদের সম্মুখে কোটি টাকা দিলেও ছতর (লজ্জাস্থানে) খুলতে শরমবোধ করত, সে কিশোরী তথাকথিত খেতাব ও সর্বোচ্চ সুনাম অর্জনের মোহে জিমন্যাষ্টিকস (Gymnastic) কোটে হাজার হাজার পুরুষদের সামনে "ফ্রি ষ্টাইল ফিগার প্রতিযোগিতা" ও "শারীরিক কসরত প্রদর্শনীর" নামে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদর্শন করতে বাধ্য হচ্ছে। খেলাধূলার নামে জিমন্যাষ্টিকের মত অশ্লীল ও যৌন সুড়সুড়ীমূলক খেলা মনে হয় পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই। কারণ, এ খেলাটা শুধুমাত্র উঠতি বয়সের কিশোরীদের জন্য নির্ধারিত। এতে কিশোরীর গোপনীয় অঙ্গ উন্মুক্ত রাখতে হয়। তাই ঐসব নারীলোভী, যৌনবাদী, বুদ্ধিজীবী এবং সুস্থ বিবেকহীন, বুদ্ধিহীন সুনামলোভী নারীদের বলতে চাই যে, এসব কার্যকলাপ "নারী স্বাধীনতা" না-কি "যৌন- উচ্ছৃংখলতা"? ইসলাম পূর্ব অন্ধকার যুগে উপপত্নী, দাসীবৃত্তি ও গনিকাবৃত্তির নামে সম্মানিত নারী জাতিকে করা হয়েছিল ভোগের সামগ্রী। বর্তমানে তথাকথিত সভ্যতার

যুগে শিক্ষা-সাংস্কৃতি, চাকুরী-বাকুরী ও খেলাধূলার মাধ্যমে "নারী স্বাধীনতার" নামে নারীকে সেই ভোগের সামগ্রীতেই পরিণত করা হচ্ছে।

আদর্শ স্ত্রীকে গভীরভাবে বিবেক দিয়ে অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম পর্দা প্রথার মাধ্যমে নারী জাতিকে যে মর্যাদা দিয়েছে, সেটা-ই প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা। কারণ, দয়াময় আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য এমন কোন বিধান বাধ্যতামূলক করতে পারেন না, যা বান্দাদের জন্য বাস্তবেই বড় মুশকিল, কষ্টকর, ক্ষতিকর। বরং মেহেরবান দয়ালূ মহান প্রভু যা কিছু ফরজ করেছেন, তা বান্দাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য। এটাই আল্লাহর "রাহমান" "রাহীম" ও "কারীম" নামের সার্থকতা নির্দেশ করে।

তালাক অধ্যায়

তালাক প্রসঙ্গে জরুরী কথা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম, মুসলিম বিশ্বের রাহবার, পীরে কামেল হযরত আল্লামা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী (রঃ) আদর্শ স্ত্রীর বিভিন্ন গুণাগুণ ও তার কি কি করণীয়, কি কি বর্জনীয় তা বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করার পর এ পর্যায়ে তালাক ও তার নিন্দাবাদ সম্বলিত কিছু কথা, কিছু পর্যালোচনা পাঠক/পাঠিকাদের উপহার দিয়েছেন। ঐ পর্যালোচনার পূর্বে আমি (অনুবাদক) তালাক প্রসঙ্গে কিছু জরুরী কথা পেশ করা সমীচীন মনে করছি।

এ বিশ্ব-বসুন্ধরায় মহান আল্লাহ অসংখ্য মাখলূক সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে আশরাফুল মাখলুকাত হল মানবজাতি। এ মানবজাতির মধ্যে রয়েছে দু'টি প্রকার। (ক) পুরুষ ও (খ) নারীজাতি। মহান আল্লাহ নারীদেরকে পুরুষদের এবং পুরুষদেরকে নারীদের মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন।

তারা সৃষ্টিগতভাবে বিয়ে-শাদী করতে বাধ্য। শরীয়ত মানুষের সৃষ্টিগত দাবীসমূহকে পদদলিত করেনি; বরং সেগুলোর রেয়াত করেছে। ইসলাম ব্যভিচারকে হারাম করেছে। বিধায় বিবাহ করা আইনত প্রশংসনীয়ই নয়; বরং কতক পরিস্থিতিতে ওয়াজেব। তাই স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আজীবন পরস্পরের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। মাঝে মাঝে স্বাভাবিকভাবে কিছু মন কষাকষি হয়ে গেলে মনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্ষমা করে; দেয়া সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্যে একটি জরুরী বিষয়। পুরুষদেরকে নবী করীম (সাঃ) কয়েক প্রকারে বুঝিয়েছেন এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন।

মহানবী (সাঃ) যেমনিভাবে পুরুষদেরকে আদেশ দিয়েছেন তেমনিভাবে নারীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তারা যেন তালাকের প্রশ্ন না তুলে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করে। কোন এক জায়গায় দু'চারটি পাত্র থাকলে সেগুলোর মধ্যে ঠোকাঠুকি অবশ্যই হয়। এমনিভাবে দু'জন এক সাথে থাকলে কখনও কিছু না কিছু মন কষাকষির অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়। কাজেই যতদূর সম্ভব আজীবন পারস্পরিক সম্প্রীতি বজায় রেখে চলা উচিত।

বর্তমানে নারীরা স্বামীর সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলার মেজাজ যেন খতম করে দিয়েছে। সামান্য মনোমালিন্য তা হলেই স্বামীকে বলা হয়-তুমি আসল মা-বাপের জন্ম দেয়া হলে এই মুহূর্তে আমাকে তালাক দিয়ে দাও।

অথচ বিবাহ তালাক দেয়ার জন্যে নয়; বরং আজীবন দাম্পত্যিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে হয়ে থাকে। পুরুষ তালাক দিয়ে দিলে তালাক হয়ে যায় ঠিক; কিন্তু তালাক দেয়া ইসলামের মেজাজের বিপরীত। এক হাদীসে বলা হয়েছে- হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণিত হচ্ছে তালাক।

তবে কতক ক্ষেত্রে এমনসব সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, বনিবনার পথই রুদ্ধ হয়ে যায়। এরূপ কমই হয়; কিন্তু ইসলাম এর প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। এহেন পরিস্থিতিতে পুরুষ যদি তালাক দিয়ে দেয় অথবা নারী তালাক চায়, তবে এটা হাদীসে বর্ণিত শাস্তিবাণীর অন্তর্ভূক্ত নয়। এক্ষেত্রে একটি জরুরী কথা এই যে, তালাক দেয়ার তালাক নেয়ার যতই অবকাশ বা সুযোগ থাকুক না কেন এ সুযোগ গ্রহণ না করা উচিত; বরং যতদূর সম্ভব পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে ত্রুটি বিচ্যুতি সংশোধন করিয়ে জানের জান, প্রাণের প্রাণ হয়েই জীবন যাপন করা প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর আবশ্যকীয় কর্তব্য। তালাক দেয়া সহজ, কিন্তু এর ক্ষতি যে কত সর্বগ্রাসী, সর্বনাশী ও সুদূর প্রসারী, তা উপলব্ধি করা একান্ত ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ সর্বনাশ ও ক্ষতি থেকে মুসলামনদেরকে দূরে রাখার লক্ষে অধর্ম অনুবাদক "সর্বনাশা তালাক" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছে। সম্মানিত পাঠকদের অবশ্যই এক কপি সংগ্রহ করার জন্য দাওয়াত দিচ্ছি।

তালাকের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

তালাকের আভিধানিক অর্থ ঃ তালাক এটা বিশুদ্ধ আরবী শব্দ এবং বিশেষ্য। এ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর মূল ধাতু ق ل ط ত্ব-লাম-কফ। বাবে نصر হতে বাংলা অর্থ হচ্ছে বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ, বৈবাহিক সর্ম্পক বর্জন ও দাম্পত্য-বন্ধন প্রত্যাখ্যান করা। উদ্দু-আরবী "আল-মুনজিদ" অভিধান গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ রয়েছে ঃ

طلاقا المرأة من زوجها

অর্থ ঃ স্বামী থেকে স্ত্রীর পৃথক হওয়া এবং তাকে ছেড়ে দেয়া।

তালাকের পারিভাষিক অর্থঃ ফুকাহাদের পরিভাষায় তালাক বলা হয় এমন শরয়ী হুকুমকে, যা বিশেষ কিছু শব্দ দ্বারা বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়।

তালাকের কারণ ঃ এমন প্রয়োজন, যা স্বামী বা স্ত্রীকে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করতে বাধ্য করে।

তালাকের শর্ত ঃ তালাক হওয়ার শর্ত এই যে, তালাক প্রাপ্তা মহিলা তালাক দাতা পুরুষের স্ত্রী হতে হবে, বিশেষ শর্ত হচ্ছে স্বামীর আকেল বালেগ হওয়া। সুতরাং পাগল শিশু ও ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হবে না।

তালাকের হুকুম ঃ স্ত্রীকে ভোগ করার মালিকানা (অধিকার) বিলুপ্ত হওয়া।

কি কি শব্দ উচ্চারণ করলে তালাক হয় না

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সাধারণভাবে তালাক বা বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার কেবল স্বামীরই রয়েছে। স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটানোর অধিকার স্ত্রীকে দেয়া হয়নি। ন্যায়ভাবে হোক বা অন্যায়ভাবে হোক, স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে বা তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে। তবে কিছু কিছু শব্দ এমনও আছে, যা বললে তালাক হয় না। যেমন ঃ–

* স্বামী স্ত্রীকে বলল, আমি তোমাকে তালাক দিব। তাহলে তালাক পতিত হবে না।
* স্ত্রী স্বামীকে বলল, আমি তোমাকে এক তালাক বা তিন তালাক দিলাম। এতে তালাক হবে না। কারণ, স্ত্রীর তালাক দেয়ার অধিকার নেই।

* স্বামী যদি বলে, আমি মুতাল্লাকাহ, তালাক প্রাপ্ত, তাহলে তালাক হবে না।
* পাগল স্বামী তার স্ত্রীকে বলল ঃ এক তালাক, দু'তালাক, তিন তালাক, তোরে দিলাম ঘর ভরে তালাক। এতে তালাক হবে না, স্বামী পাগল হওয়ার কারণে।
* ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দিয়ে যদি এমন কথা বের হয়ে যায়, "তোমাকে আমি তালাক দিলাম।" এতে তালাক হবে না।
* কোন না বালেগ স্বামী তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল। এতে কোন তালাক হবে না।
* স্বামী রাগান্বিত হয়ে মনে মনে স্ত্রীকে বার বার তালাক দিল, কিন্তু মুখে কিছু উচ্চারণ করল না। এভাবে বললে তালাক হয় না।
* স্ত্রী স্বামীকে বলল, আমি তোর মা হই বা বোন হই। এতেও তালাক হবে না।
* স্ত্রী রাগন্বিত হয়ে স্বামীকে বলল, আমাকে তালাক দে। স্বামী বলল, ইনশাআল্লাহ দিলাম। এতে তালাক হবে না।
* স্বামী স্ত্রীর দাবীর মুখে বলল, ঠিক নেই আগামীতে হয়ত তোমাকে তালাক দিয়েও দিতে পারি। এমন বললে তালাক হবে না।
* স্ত্রী বলছে, আমারে ছাইরা দে। আমি তোর ভাত খামু না। স্বামী বলল, আল্লায় চাইলেই ছাইরা দিমু। এতে তালাক হবে না।
* স্বামী বলল, আমি কিছু দিনের মধ্যে তোমাকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা রাখি। এতে তালাক হবে না।
* স্বামী স্ত্রীকে বলল, আমি তোর বাপ লাগি। এতে তালাক হবে না।
* স্বামী স্বপ্নে দেখল যে, সে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। উপস্থিত এ তিন তালাকের কথা অনেকেই শুনেছে। কিন্তু জাগ্রত হয়ে দেখে, তার স্ত্রী তার পাশেই নিদ্রিত। এতে তালাক হবে না। কারণ, স্বপ্নে তালাক দিলে তালাক হয় না।
* স্বামী স্ত্রীকে বলল, তুমি আমার মা হও। এতে তালাক হবে না।
* স্বামীর বন্ধুরা স্বামীকে বলল, স্ত্রীকে তালাক দে। স্বামী বলল, তালাক দিব কি দিব না একটু ভেবে দেখি, এতে তালাক হবে না।

* স্বামী বলল, আজ হোক কাল হোক, তোমাকে তালাক দিব। তবে তালাক হবে না।

* স্বামী স্ত্রীকে বলল, যদি তুমি অমুক কাজ কর, তাহলে, তোমাকে তালাক দিব। কিন্তু দিলাম শব্দ বলেনি। এতে তালাক হবে না।

* স্বামী বলল, যদি তুমি বাপের বাড়ি যাও, তাহলে তালাক দিব। এরূপ বললে তালাক হয় না।

* যে সমস্ত শব্দ দ্বারা স্ত্রীকে ধমকানো বা গালমন্দ করা উদ্দেশ্য হয়, সে সমস্ত শব্দে তালাক হয় না।

* স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তোমার হাতকে তালাক অথবা তোমার পা'কে তালাক, তাহলে হবে না।

* যদি কেহ কোন বেগানা মেয়েকে বলল, যদি তুমি আমার ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে তালাক। কিছু দিন পর ঐ মেয়েকে বিবাহ করল। অতঃপর উক্ত স্ত্রী ঐ ঘরে প্রবেশ করল। এতে তালাক হবে না।

* যদি কোন স্বামী পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের পরিস্থিতি অথবা ক্রোধান্বিত অবস্থায় না থাকে এবং তালাকের আলোচনা অবস্থায়ও না থাকে, নিজ স্ত্রীকে বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, তুমি হারাম, তোমার লাগাম তোমার গলায়, তোমার দায়িত্ব তোমার হাতে, তুমি আত্মীয়দের নিকট চলে যাও, তোমাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তুমি মুক্ত, আমি তোমাকে তোমার মাতা-পিতার নিকট অর্পণ করে দিলাম, আমি তোমাকে দান করলাম, আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে যাকাত স্বরূপ দিলাম, আমি তোমার দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম, তুমি এখন থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমি তোমাকে পৃথক করে দিলাম, তুমি স্বাধীন, তুমি মুখ ঢেকে নাও, তুমি পর্দা গ্রহণ কর, তুমি দূর হয়ে যাও, তুমি অন্য স্বামী তালাশ কর, তাহলে তালাক পতিত হবে না। তবে হ্যাঁ, উল্লেখিত শব্দগুলো বলার সময় যদি স্বামীর নিয়্যতে তালাক দেয়ার থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। নিয়্যতে না থাকলে, তালাক হবে না। উল্লেখিত শব্দগুলো কেনায়ার **আরবী** শব্দ। এতে তালাক হওয়া না হওয়ার দুটোরই সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তালাক হওয়া নিয়্যতের উপর নির্ভর করে।

কি কি শব্দ উচ্চারণ করলে তালাক হয়ে যায়

* স্বামী যদি আকেল (বুদ্ধিমান) বালেগ এবং উন্মাদ না হয়, তাহলে সে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে।

* স্ত্রী বলল, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। স্বামী বলল, যা আমি তোরে ছেড়ে দিলাম। তাহলে তালাক হয়ে যাবে।

* স্ত্রীর প্রেমিকেরা স্বামীর বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে স্বামীকে বাধ্য করল তালাক শব্দ বের করতে। আর স্বামী প্রহার বা মৃত্যুর ভয়ে মুখ দিয়ে বলল, "আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম" তাহলে তালাক হয়ে যাবে। উপায়হীন হয়ে তালাক দিলেও তালাক হয়। তবে শর্ত, স্বামী মুখ দিয়ে তালাক শব্দ উচ্চারণ করতে হবে।

* হিরোইনখোর স্বামী হিরোইনের টাকা যোগাড় না হওয়ার কারণে নেশা অবস্থায় স্ত্রীকে বলল, তোরে তালাক দিলাম। এতে তালাক হয়ে যাবে।

* ঈদের শাড়ী মনপূত না হওয়ার কারণে প্রথমে মান-অভিমান, অতঃপর কথা কাটা-কাটি, তারপর ঝগড়া-ঝাটি, অতঃপর স্ত্রীর দাবী "আমি তোর ভাত খামুনা, আমারে তালাক দে"। স্বামী রাগান্বিত হয়ে বলল, "যা তোরে তালাক দিলাম।" এতে তালাক হয়ে যাবে।

* স্ত্রী তালাক দাবী করে রান্না ঘরে চলে গেল, এদিকে স্বামী শুয়ে শুয়ে মুখে বলল, "যা তোর মনের আশা পূর্ণ করে তোরে তালাক দিলাম।" স্ত্রী বা অন্য কেউ তালাকের শব্দ শ্রবণ করেনি। শুধু স্বামী শুনেছে। তাতে তালাক হয়ে যাবে।

* স্ত্রী রাগ করে বলল, "তোমার আমার মধ্যে মতানৈক্য চলছে, এর চেয়ে ভাল আমাকে ছেড়ে দাও। স্বামীও বলল, আমি তোকে ছেড়ে দিলাম। এতে তালাক হয়ে যাবে।"

* যদি কোন নির্বোধ স্বামী তার স্ত্রীকে "হে তালেকীন" বলে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে।

* স্ত্রী স্বামীকে বলল, আমি কিন্তু বাপের বাড়ি যাব। স্বামী বলল, যদি তুমি বাপের বাড়ি যাও, তাহলে তালাক দিব। স্ত্রী বাধা ও নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বাপের বাড়ি চলে গেল। এতে তালাক হয়ে যাবে।

* স্ত্রী চিন্তা করল যে, স্বামীর শারীরিক যে অবস্থা, তাতে সুস্থ হওয়ার

কোন লক্ষণ নেই। তাই অন্য এক পুরুষের সাথে মন নেয়া-দেয়া শুরু করল। স্বামী টের পেয়ে বলল, যদি তুমি আমার অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাও, তাহলে তুমি তালাক। স্ত্রী গোপনে ঘরের বাইরে চলে গেল। এতে ঐ স্ত্রীর উপর তালাক পড়ে যাবে।

* স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস হওয়ার পর স্বামী বলল, আমি সহবাস করিনি। এরপর স্ত্রীকে তালাক দিল। তাহলে তালাক পড়বে।

* স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ চলছিল। আর নির্বোধ স্ত্রী বার বার তালাক দাবী করছিল। তখন স্বামী তালাকের নিয়্যতে বলল, তুমি হারাম, তোমার লাগাম তোমার গলায়, তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও, তোমার দায়িত্ব তোমার হাতে, তুমি মুক্ত, তুমি আত্মীয়দের নিকট চলে যাও, আমি তোমাকে সদকা করলাম, তুমি স্বাধীন, আমি তোমার দায়িত্ব ছেড়ে দিলাম, তুমি দূর হয়ে যাও, তুমি অন্য স্বামী তালাশ কর, তুমি আমার থেকে পর্দা কর, এখন থেকে তুমি স্বয়ংসম্পূর্ণ, আমি তোমাকে পৃথক করে দিলাম .... ইত্যাদি। তাহলে তালাক হয়ে যাবে। এরকম কিছু একটা বললে তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ বিস্তারিত জানার জন্য অভিজ্ঞ মুফতী সাহেবদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। ধন্যবাদ।

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষ গুণ

শরয়ী কারণ ছাড়া তালাক না চাওয়া

হযরত মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী (রঃ) উল্লেখিত শীর্ষনামে একটি হাদীস উপস্থাপন করেছেন। যার অর্থ ঃ হযরত ছাউবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে স্ত্রী কোন কারণ ও উযর ব্যতীত স্বীয় স্বামী থেকে তালাক দাবী করে, তার জন্য জান্নাতের খুশবু হারাম। -মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী

শরয়ী কারণ ব্যতীত খুলা' দাবী করা মুনাফেকী

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, স্বীয় স্বামীর নিকট থেকে বিচ্ছেদ ও খুলা' (টাকা ইত্যাদি প্রদান করে তালাক) দাবীকারিনী নারী মুনাফেক।

-তিরমিযী শরীফ

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ বিশ্ব বিধাতা মহান আল্লাহ পুরুষ জাতিকে নারীর এবং নারী জাতিকে পুরুষের মুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী প্রকৃতিগতভাবে উভয়েই বিবাহ-শাদী করতে বাধ্য। পবিত্র ইসলামী শরীয়ত মানব-মানবীর মানবীয় প্রাকৃতিক চাহিদা পদদলিত , অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেনি। বরং এ মানবীয় চাহিদার যথার্থ মূল্যায়ন করেছে। ইসলাম যেনা-ব্যভিচারকে হারাম ঘোষণা দিয়েছে। সুতরাং মুসলিম সমাজে বিবাহ প্রথা শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি উত্তম ও প্রসংশনীয় প্রথা। বরং স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে কারো জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব। কোন নারীর কোন প্রকার পুরুষের সাথে বিবাহ বৈধ এবং কার সাথে বিবাহ হারাম শরীয়ত তার বিস্তারিত আলোচলা করেছে। বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীদের নিকট থেকে বিস্তারিত জেনে নেয়া প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য জরুরী।

বিবাহ প্রথা জীবনভর দায়িত্ব সম্পাদন করা জন্য

পূর্বোল্লেখিত পর্যালোচনাকে সম্মুখে রেখে যখন কোন পুরুষের কোন মুসলমান নারীর সাথে বিবাহ হয়ে যায়, তখন পরস্পর পরস্পরকে জীবনভর চাওয়া-পাওয়ার এবং একে অপরের হক আদায়ের প্রতি সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া প্রতিটি দম্পত্তির জন্য আবশ্যক ও জরুরী হয়ে যায়। যদি কখনও উভয়ের মধ্য হতে কোন একজনের সাথে অন্যজনের অপ্রীতিকর কিছু দেখা দেয়, তাহলে স্বীয় অন্তরকে শান্তনা দিয়ে, ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে সংসারধর্ম পালন করতে হবে। বৈবাহিক দায়িত্ব পালনের জন্য এটা খুবই জরুরী। মহানবী (সাঃ) পুরুষ জাতিকে বিভিন্নভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন এবং স্ত্রীদের সাথে সুখময় জীবন যাপন করার আদেশ প্রদান করেছেন। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে এ বিষয় সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন, "মুমিন পুরুষ যেন মুমিন নারীর সাথে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করে। কেননা, যদি তার (স্ত্রীর) মধ্যে কোন একটি স্বাভাব খারাপ থাকার দরুণ তাকে অপছন্দ করে, তাহলে তার মধ্যে অপর এক ভাল গুণ থাকার দরুণ তাকে সে পছন্দ করবে।"

অন্য একটি হাদীস হযরত মু'আবিয়া ইবনে হাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! স্বামীর দায়িত্বে স্ত্রীর কি কি অধিকার (হক) রয়েছে? মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, "যখন তুমি আহার করবে, তাকেও আহার করাবে। যখন তুমি কাপড় পরিধান করবে, তাকেও করাবে। আর তার চেহারায় প্রহার করবে না। অশ্লীল গালি-গালাজ করবে না। ঘরের মধ্যে ছাড়া তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।"
- আবু দাউদ

প্রিয় নবীজী (সাঃ) স্ত্রীদেরকে কতটুকু মূল্যায়ন করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত মহানবী (সাঃ)-এর একটি হাদীস দ্বারা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

"আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য (পরিবারের লোকদের পিছনে) তুমি যে (কোন বৈধ পন্থায়) খরচ কর না কেন, তোমাকে প্রতিদান দেয়া হবে; এমনকি (খাদ্যের) যে লোকমা তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দিচ্ছ, তাতেও।"

প্রিয় নবীজী (সাঃ) যেমনিভাবে পুরুষ জাতিকে আদেশ দিয়েছেন স্ত্রীদের সাথে খুব ভাল ব্যবহার করতে, তেমনিভাবে নারী জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ঘুর্ণাক্ষরেও কখনো স্বামীর নিকট তালাক দাবী করবে না; বরং স্বামীর কর্কশ ভাষা ও দুর্ব্যবহারকে আমায়িক সুব্যবহার দ্বারা এবং তার অপরাধকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দ্বারা মুছে ফেলে তাকে সুখময় জীবন উপহার দিতে। দু'চারটে কলস একত্রিত হলে ঠন ঠন শব্দ হওয়া স্বাভাবিক। এমনিভাবে দু'জন মানুষ যখন একত্রে বসবাস করে, তখন ঝগড়া-ঝাটি ও অপ্রীতিকর কিছু ঘটনা বা আচরণ ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। যদি ধৈর্য্য ধারণ না করা হয় এবং মনকে অপ্রীতিকর আচরণ সহ্য করার যোগ্য করে না তোলা হয় এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার মন-মানসিকতা তৈরী না হয়, তাহলে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। অতঃপর আগত দিনগুলোতে বিবাহ বিচ্ছেদের শ্লোগান দিতে থাকবে, কথায় কথায় তালাক চাইতে থাকবে। সন্তানগুলোর জীবন মাটি হয়ে যাবে। আর ভবিষ্যৎ হয়ে যাবে ছাইভষ্ম। পুনরায় উভয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী তালাশ করতে হবে। ছোট ছোট, কচি কচি বাচ্চাগুলো হয়ত মায়ের সাথে দিন কাটাবে। ওরা বুঝতেও পারবে না কেন এমন হল? কেন তাদের মাতা-পিতা পৃথক পৃথক বসবাস করছে? তালাক পরবর্তী

পরিস্থিতি এমন দাড়াবে যে, স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে সহস্রগুণ মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে। আনন্দঘন পরিবেশ ও সোহাগমাখা রোমাঞ্চকর স্মৃতিগুলো হৃদয়পটে ভাসতে থাকবে। মনটা বড় অস্থীয় হয়ে উঠবে। একে অপরকে প্রচন্ডভাবে কাছে পেতে চাইতে। কারণ, এত কাছের মানুষটা এখন অচেনা। এত মনের মানুষটা এখন বেগানা।

সুতরাং যতদূর সম্ভব স্বামীর মন যুগিয়ে চলা প্রতিটি আদর্শ স্ত্রীর অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য। অনেক স্ত্রী এমনও রয়েছে, যারা বড় বদমেজাজ ও কর্কশভাষিনী। কথায় কথায় স্বামীর সাথে লড়াই-ঝগড়া করে, তর্ক-বির্তক করে। যে হক আদায় করা স্বামীর দায়িত্বে ওয়াজিব নয়, তাও স্বামীর নিকট দাবী করে। স্বামী বেচারা পূর্ণ করতে না পারলে বাঁদরমুখী হয়ে অশ্লীল কথা দ্বারা স্বামীকে ঝাড়ুপেটা করে। কালো-কৃষ্ণ কালীর মত মূখ কালো করে বসে থাকে, আর গাল ফুলিয়ে গোবিন্দোর মায়ের মত রূপ ধারণ করে। অধিকন্তু স্বামীর অতীতের সমস্ত অনুগ্রহ ও সুব্যবহার অস্বীকার করে। অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রতিনিয়ত। স্বামী যদি কোন কথার উত্তর দেয়, তাহলে তালাকের দাবী তোলে। "তালাক দে" "তালাক দে", তোর ভাত খাবনা, তোর মুখ দেখব না, তোর সাথে থাকব না, "তুই আমার বাপ লগিস", ইত্যাদি বলতে থাকে। অপরিনামদর্শী নারীদের এই বদমেজজ ও নিবুদ্ধিতার কারণেই শাশ্বত ইসলামী শরীয়ত নারীদেরকে তালাক দেয়ার অধিকার ও ক্ষমতা দেয়নি। অন্যথায় দাজ্জাল ও ডাইনী প্রকৃতির স্ত্রীরা প্রতিদিন স্বামীকে কয়েকবার তালাক দিয়ে প্রশান্তি লাভ করত। বিবাহ প্রথা তালাক দেয়ার জন্য নয়, বরং জীবনভর স্বামী-স্ত্রী রূপে সুখময় দাম্পত্ত জীবন অতিবাহিত করার জন্য। কিন্তু স্বামী যদি দাজ্জাল স্ত্রীর আকাঙ্খা পূর্ণ করতে যেয়ে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু তালাক দেয়া ইসলাম পছন্দ করে না।

স্ত্রীকে তালাক দেয়া নিকৃষ্টতম কাজ

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে তালাক দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে, সামাজিক দৃষ্টিতে একটি জঘন্য ও নিকৃষ্টতম কাজ। আবু দাউদ শরীফে এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) এর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

হালাল জিনিস সমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য ও ক্রোধের জিনিষ হল (স্ত্রীকে) তালাক দেয়া।

যখন সুখ দুঃখের সাথী হয়ে স্বামী-স্ত্রীরূপে জীবন যাপন করা ইসলামের আদেশ, তখন তালাক দাবী করা সরাসরী ইসলাম বিরোধী কাজ। এজন্যই হুজুরে আকরাম (সাঃ) তালাক বা খুলা' দাবী উত্থাপনকারীনী নারীকে মুনাফেক বলেছেন।

শাশ্বত ইসলামের দাবী অনুযায়ী জীবন যাপন না করা আবার খাঁটি মুসলামন হওয়ার দাবী করা এটা দ্বি-মুখীপানার কথা। যে মুনাফিক সে, দোদিল এবং দ্বি-মুখী হয়। প্রকাশ্যে একরকম আর গোপনে আর এক রকম। সবচে' বড় মুনাফিক ঐ ব্যক্তি, যে মনের দিক থেকে মুনাফিক, আবার মুসলমান হওয়ার দাবী করে। তবে যে ব্যক্তি অন্তরে ইসলাম সত্য হওয়ার বিশ্বাস পোষণ করে, কিন্তু ঈমানী দাবী অনুযায়ী পূর্ণ আমল করে না, তাকে আমলের দিক দিয়ে মুনাফিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি ঈমানদার কিন্তু আমলী মুনাফিক।

হাদীস শরীফে অনেক কাজ কর্ম, অনেক আলামত বা চিহ্নকে মুনাফিকের চিহ্ন বলা হয়েছে। একটি হাদীসে ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে চারটি আলামত পাওয়া যাবে, সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে চারটির মধ্যে একটি পাওয়া যাবে, তার সম্পর্কে বলা হবে যে, তার ভিতর মুনাফেকির একটি আলামত রয়েছে, যতক্ষণ না সে ঐটা পরিত্যাগ করবে। চারটি আলামত বা চিহ্ন নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। তার নিকট আমানত রাখলে খেয়ানত করে।
২। যখন কথা বলে, তো মিথ্যা বলে।
৩। ওয়াদা করলে ওয়াদা ভঙ্গ করে।
৪। যখন ঝগড়া করে তো গালিদেয়।

-বুখারী ওমুসলিম

যেহেতু উক্ত ব্যক্তি আমলের দিক দিয়ে ঈমানী দাবীকে পদদলিত করে এবং তার আমল ঈমানী দাবীর পরিপন্থী, এ জন্যে তাকে মুনাফিক বলা হয়েছে। এমনিভাবে মুমিন হওয়ার দাবী করে স্বামীর নিকট তালাক দাবীকারীনীকেও মুনাফিক বলা হয়েছে। কেননা, আমলের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাও মুনাফেকী।

তবে অবশ্য, কোন কোন সময় পরিস্থিতি এমন ঘোলাটে হয়ে যায়, এবং সংসার পরিচালনায় সমস্যা এমন জঠিলরূপ ধারণ করে যে, কোন অবস্থাতেই স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে বসবাস করা সম্ভব হয়ই না। তখন শাশ্বত ইসলামও এ কঠিন সমস্যা সমাধানের একটা ব্যবস্থা রেখেছে। এমতাবস্থায় স্বামীর নিকট তালাক দাবী করে, তাহলে তাদের জন্য ধিক্কার বা ধমকী নেই। পূর্বোল্লেখিত একটি হাদীস শরীফে নবীজির (সাঃ) ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে যে, স্ত্রী যদি কোন শরয়ী উযর বা কারণ ছাড়া তালাক দাবী করে, তাহলে তার জন্য জান্নাতের খুশবু হারাম। উযর বা কারণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন- স্বামী মডার্ণ তাই স্ত্রীকে নামায পড়তে দেয় না, গুনাহ করতে বাধ্য করে, অন্যায়ভাবে শারীরিক নির্যাতন করে অথবা স্ত্রীর অধিকার আদায়ে একেবারেই অক্ষম। আর এ অক্ষমতা অদূর ভবিষ্যতে দূর হওয়ারও কোন সম্ভবনা নেই। এমতাবস্থায় স্বামীর নিকট তালাক দাবী করা বা খুলা' করা কিংবা অবস্থার পরিপেক্ষিতে কোন মুসলিম বিচারক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করার অনুমতি ইসলাম স্ত্রীকে প্রদান করেছে। বরঞ্চ, স্বামী যদি নাস্তিক-মুরতাদ বা কুফুরী মতবাদে বিশ্বাসী হয়, সে অবস্থায় তো বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে স্বামীর থেকে পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করা স্ত্রীর আবশ্যকীয় কর্তব্য।

নারীর জিদের বশবর্তী হয়ে তালাক দাবী করা ভুল

বর্তমান এ আধূনা যুগে মহিলারা নারী অধিকার আদায় ও নারী স্বাধীনতার শ্লোগানে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামীর সাথে জীবন যাপন করার মন মানসিকতা একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। সামান্য মতবিরোধ, মতানৈক্য ও অনবনদ দেখা দিলেই অপরিণামদর্শী মডার্ণ মেয়েরা স্বামীকে বলে, তুই যদি এক বাপের জন্ম হইস, তাহলে তুই আমাকে এখনই তালাক দিবি। অথচ বুদ্ধিমতী প্রেমময়ী স্ত্রীর কর্তব্য এই ছিল যে, স্বামীর মেজাজ, ভাষা ও আচরণ যখন গরম হতে দেখল, তখন সাথে সাথে স্বামীর সম্মুখ থেকে দূরে সরে যাওয়া অথবা নিজের মুখ বন্ধ রাখা, যাতে স্বামী রাগান্বিত হয়ে তালাকের শব্দ মুখ থেকে বের করতে না পারে। আর জিদ্দিরাণী, নির্বোধ স্ত্রীর দাবী পূর্ণ করতে অজ্ঞতার কারণে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে গোঁয়াড় স্বামী যখন তালাকের অশান্তিমাখা শব্দগুলো কণ্ঠনালী দ্বারা বের করে, তখন মেশিনগান, শর্টগান চালু করে দেয়। তিন তালাকের কমে তো ক্ষান্ত হয়ই

না। স্ত্রীও তিন তালাকের কমে সন্তুষ্ট হয় না। বোধোদয় হয় যখন, তখন আর কিছুই করার থাকে না একমাত্র দুঃখ ও আফসোস করা ছাড়া। তাই স্ত্রীদের খুবই সতর্কতার সাথে প্রতিটি কথায়, প্রতি কাজে পদক্ষেপ নিতে হবে। পরে দুঃখ করার চেয়ে পূর্বেই সর্তক হওয়া শ্রেয়। এ কথাটি আদর্শ স্ত্রীকে হৃদয় দিয়ে, বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।

দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করার ফযীলত

এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দ শহরী একটি হাদীস পেশ করেছেন। যার অর্থ ঃ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একদা মহানবী (সাঃ) মহিলা সাহাবী হযরত উম্মুস সায়িব (রাঃ) এর নিকট গমন করলেন। তার শারীরিক (অসুস্থ) অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি থরথর করে কাপছ কেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমার জ্বর হয়েছে। জ্বরের অমঙ্গল (ধ্বংস) হোক। নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, জ্বরকে গালী দিও না। কেননা, জ্বর মানুষের (মুসলমানদের) গুনাহকে এমনভাবে মুছে ফেলে, যেমনভাবে কর্মকারের হাপড় লোহার ময়লাকে দূর করে দেয়।

উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা ঃ

অভিশাপ দেয়া, বদ দুআ দেয়া পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুকে গাল-মন্দ করা অধিকাংশ নারীর স্বভাব। এরা স্নেহাস্পদ পেটের সন্তানকেও অভিশাপ দেয়, বদদুআ দেয়। জীব-জন্তুকেও অশালীন ভাষায় গালি দেয়। কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে।

হযরত উম্মস্ সায়িব জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। রাহমাতুল-লিল-আলামীন, দোজাহানের সরদার, প্রিয় নবীজী (সাঃ) উক্ত সাহাবীয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়ার উদ্দেশ্যে তার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি নারীদের চিরাচরিত বদ অভ্যাস অনুযায়ী মন্তব্য করলেন যে, মরার জ্বর আমাকে কষ্টে পতিত করেছে, আল্লাহ যেন ওর অমঙ্গল (ধ্বসং) করেন। একথা দয়ার নবী (সাঃ) এর মনোপুত হল না। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করলেন, জ্বরকে মন্দ বলবে না। কারণ, সে তোমার কোন ক্ষতি বা অন্যায় করেনি। বরং সে তো তোমার শুভাকাঙ্খী ও উপকারী। কেননা, জ্বরের

কারণে পাপসমূহ ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং ভুল-ত্রুটি দূর হয়ে যায়। যে জিনিষ পাপ মোচনের হেতু তাকে মন্দ বলা, অভিশাপ দেয়া মুমিনের জন্য শোভা পায় না।

এ পর্যায়ে হযরত বুলন্দ শহরী ধৈর্য্যধারণ করার ফযীলত সম্বলিত একটি হাদীস পেশ করছেন। যার অর্থ ঃ প্রিয় নবীজীর (সাঃ) প্রিয় সাহাবী হযরত আতা ইবনে আবি রাফে (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলেছেন, তোমাকে কি একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি জনৈকা মহিলার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন যে, (লক্ষ্য কর) এই কৃষ্ণাঙ্গী (কাল বর্ণের) মহিলা। তার জন্য জান্নাতী হওয়ার শুভসংবাদ রয়েছে। তার ঘটনা এই যে, সে একদা নবীজীর (সাঃ) দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করল যে, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। আমি মাঝে মাঝে মৃগী রোগে আক্রান্ত হই। ঐ মূহুর্তে আমার অঙ্গ থেকে কাপড় সরে যায়, বিধায় অঙ্গ খুলে যায়। আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার জন্য দু'আ করুন, যেন আমার কষ্ট দূর হয়ে যায়। নবীজী (সাঃ) ইরশাদ করেন, যদি তুমি চাও, তাহলে ধৈর্য্য ধারণ কর। আর তুমি এর বিনিময়ে প্রাপ্ত হবে জান্নাত। আর যদি চাও, তাহলে আমি দু'আ করব, আল্লাহ যেন তোমাকে সুস্থতা দান করেন। এ কথা শ্রবণ করে এই বুদ্ধিমতী মহিলাটি বলেছিল, আমি ধৈর্য্য ধারণ করাকে প্রাধান্য দিলাম। অর্থাৎ অসুস্থ থাকাকে পছন্দ করলাম। হে রাসুল (সাঃ) ! আপনি এই দু'আ করে দিন যে, মৃগী রোগে আক্রান্ত অবস্থায় যেন আমার বস্ত্র শরীর থেকে সরে না যায়। নবীজী (সাঃ) তার জন্য উক্ত দু'আ করেছিলেন। এবং দু'আ কবুল হয়েছিল।

ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখিত হাদীস শরীফে ও এই কথাই বর্ণিত হয়েছে এবং বুঝানো হয়েছে যে, রোগ-শোক, অসুস্থতা, বালা মুসীবত ও কষ্ট-ক্লেশ মুমিন বান্দার জন্য নেয়ামত। যে কেউ কষ্ট সহ্য করবে এবং অসস্থতার জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা নিরবে সয়ে যাবে, তার জন্য রয়েছে বড় মর্যাদা। পুরুষ ও মহিলা সাহাবীগণ প্রিয় নবীজী (সাঃ) এর প্রতিটি কথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতেন এবং জান্নাত পাওয়াকে বিরাট দৌলত মনে করতেন। তাই তো ঐ কালো বর্ণের মহিলা সাহাবিয়াটি জান্নাতের শুভ সংবাদ শ্রবণ করে নবীজীর (সাঃ) কথায় পূর্ণ ইয়াকীন ও বিশ্বাস রেখে ধৈর্যধারণ করাকে

এখতিয়ার করল এবং মহানবীর (সাঃ) নিকট স্বীয় সুস্থতার জন্য প্রার্থণা করানোকে প্রাধান্য দিল। অবশ্য দু'আ ও প্রার্থণা এমন কামনা করল যে, রোগাক্রান্ত অবস্থায় যেন শরীর বিবস্ত্র হয়ে না যায়।

বর্তমান এই আধূনা যুগে মুসলমানের সন্তানেরা কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিধায় কখনও অসুস্থ বা রোগাগ্রস্ত হলে জ্বালা-যন্ত্রণা ও ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে। ধৈর্য্য ধারণ করলে সাওয়াব মিলে এ আনন্দের কথাটি হয়ত তাদের জানা নেই। অথবা জানা আছে কিন্তু আত্মবিশ্বাস নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কুরআন হাদীস জানা ও আমল করার তাউফীক দান করুন। - আমীন

আদর্শ স্ত্রীর বিশেষগুণ

দেন-মহর গ্রহণ করা

দেন-মহরের টাকা স্বীয় স্বামীর নিকট হতে করা-গন্ডায় বুঝে নেয়া প্রতিটি স্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক বধুরাই তাদের এ অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে অসচেতনার কারণে। অথচ শাশ্বত ধর্ম ইসলাম মুসলিম নারীকে যতগুলো অধিকার দিয়েছে, তন্মধ্যে দেন-মহর একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অধিকার। বিবাহ বন্ধনের ফলে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর প্রতি অর্পণ করার বিনিময়ে স্বামীর নিকট হতে শরীয়ত সম্মতভাবে যে অর্থ লাভের অধিকারী হয়, সে অর্থকে "মহরানা" বলা হয়। বিশিষ্ট ফকীহ ও মুহাদ্দিস শাওকানীর মতে, দেন-মহর স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার মনকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই ধার্য করা হয়েছে। জনৈক আলেম বলেছেন, দেন-মহর দ্বারা স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানও এক বিশেষ লক্ষ্য। কেউ কেউ বলেছেন, স্ত্রীকে মর্যাদার চিহ্ন স্বরূপ দেন-মহর একটি আবশ্যকীয় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ যে, বিবাহের সময় তা নির্ধারণের ব্যবস্থা রয়েছে।

যদি কোন বিবাহ এই শর্তে হয় যে, কোন মহরানা থাকবে না, তবুও বিবাহ সহীহ হয়ে যাবে, তবে স্বামী স্ত্রীকে মহরে মিছাল দিতে বাধ্য থাকবে। মহর ব্যতীত বিবাহ হওয়ার পর স্ত্রী যখন ইচ্ছা মহরে মিছালের দাবী করতে পারবে। যদি সহবাসের পূর্বেই স্ত্রী মারা যায়, তবুও স্বামীর নিকট থেকে

মহরে মিছাল গ্রহণ করা হবে। এমনিভাবে যদি সহবাসের পূর্বে স্বামী মারা যায়, তাহলে স্ত্রী মহরে মিছালের অধিকারী হবে এবং এ আবশ্যকীয় হক স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে আদায় করতে হবে। আর স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধীকারী হিসাবে অংশ পাবে, সেটি ভিন্ন।

ইসলাম নারীর দেন-মহরের অধিকারটিকে খুব গুরুত্ব দিয়েছে। দেন-মহর আদায় পুরুষের জন্য ফরীযাহ (বা ফরয) বলা হয়েছে। মহাগ্রন্থ পবিত্র আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"এদের (মুহাররামাত)কে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের (দেন-মহরের) বিনিময়ে তলব করবে, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য; ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত (দেন-মহরের) হক আদায় কর।" -সূরাহ নিসা, ৫ ঃ ২৪

ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার যুগে স্ত্রী হিসেবে নারীর কোন মূল্যই ছিল না। তাই নারীর নারীত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক দেন-মোহর আদায়ের প্রশ্নই উঠত না। যে সমস্ত পরিবারে বা বংশে নামকাওয়াস্তে মহর ধার্য করা হত, সেখানে স্ত্রীদের মহরের ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের অবিচার ও জুলুমের প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন-

* স্ত্রীর প্রাপ্য মহর তার হাতে পৌঁছাতো না; মেয়ের অভিভাবকরাই তা আত্মসাৎ করতো। যা ছিল নিতান্তই একটা নির্যাতনমূলক রিওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কুরআন পাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

"নারীদের মহর দাও খুশীর সাথে।" -সূরা নিসা, ৪

এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মহর তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মহর আদায় হলে, তা যার প্রাপ্য, তার হাতেই যেন অর্পণ করে। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

* স্ত্রীর মহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হতো। প্রথমত ঃ মহর পরিশোধ করতে হলে, মনে করা হতো-যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই আয়াতে নিহলা শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া

হয়েছে। কেননা, অভিধানে নিহলা বলা হয়, যে দান অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়।

মোটকথা, আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মহরের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

* অনেক স্বামীই তার বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মহর মাফ করিয়ে নিতো। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হয় না। অথচ স্বামী মনে করত যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেয়া গেছে, সুতরাং মহরের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরণের জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে ঃ

"যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পারবে।"

-সূরাহ নিসা

এর অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোনপ্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশী মনে মহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই তা আমাদের পক্ষে ভোগ করা জায়েয হবে।

এ ধরণের বহু নির্যাতনমূলক প্রথা জাহেলিয়্যাত যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন এসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও মুসলিম সমাজে মহর সম্পর্কিত এ ধরনের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী, এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

যেহেতু আমাদের মুসলিম সমাজে নারী জাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার "মহর" নিয়ে নানা কুসংস্কার, রকমারী অজ্ঞতা ও অনিয়ম প্রচলিত রয়েছে। ফলে নারী সমাজ হচ্ছে নিশ্চিত ও অনিবার্য প্রবঞ্চনার শিকার। অথচ নারী জাতি আমাদের সমাজের প্রায় অর্ধেক। সেই কন্যা, জায়া, জননীর প্রবঞ্চনার পরিণতি বড় করুন, ভয়াবহ ও নির্মম। একে অস্বীকার

করার উপায় নেই। নারী সমাজ বঞ্চিতা হলে মানবতাই বঞ্চিত হয়। মানবাধিকার লংঘন হয়। মানবতা অপমানিত ও পরাজিত হয়। ফলে পরিবারে ভাঙ্গন, সমাজে অশান্তি আর রাষ্ট্রে বিশৃংখলা অনিবার্য হয়ে উঠে। আজকের সমাজ ব্যবস্থা এর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এর নিরাময় হতে পারে অজ্ঞতা দূরীকরণ, সংস্কার সাধন, শরীয়াঃ আইনের বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে।

আমাদের মুসলিম সমাজের অর্ধেকই যেহেতু নারী, তাই "মহর" সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, কু-প্রথা দূরীকরণে নারী সমাজকে সচেতন হতে হবে। সেই নারী সমাজকে সচেতন করার নিমিত্ত "মহর" সম্পর্কে স্বল্প-বিস্তার অথচ খুবই গুরুত্ব আলোচনা উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করছি।

মহর এর আভিধানিক অর্থ

মহর শব্দটি আরবী। হিব্রু ভাষায় মোহর এবং সিরীয় ভাষায় মাহরা বলে। অর্থ হল, বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে স্ত্রীর (কনের) প্রাপ্য হক। শরীয়তের পরিভাষায়ঃ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে স্ত্রীকে স্বামী কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত মাল বা সম্পত্তিকে মহর বলে। যা প্রাপ্ত হওয়ার পর একমাত্র স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি স্বরূপ গণ্য হবে।

মহর এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী শরীয়তে 'মহর' এর গুরুত্ব কি, তা হৃদয়ংগম করার জন্য ফকীহদের সর্বসম্মত উল্লেখিত সিদ্ধান্ত ও বিধানটি লক্ষ্য করুন। মহর দেয়া ফরয। নির্ধারিত হলেও নির্ধারিত না হলেও। এমনকি পক্ষদ্বয় যদি 'মহর' প্রদান না করার স্পষ্ট শর্তে বিবাহ সম্পন্ন করে অথবা বলে আমি তোমার বোন/কন্যাকে বিবাহ করব এবং তুমি আমার বোন/মেয়েকে বিবাহ কর যাতে মহরের দায়িত্ব কারো থাকবেনা, তথাপি শর্তটি গোড়াতেই বাতিল ও অকার্যকর বলে পরিগণিত হবে। কারণ 'মহর' শরীয়াত নির্ধারিত অধিকার। পক্ষদ্বয়ের কোন শর্ত একে অদেয় সাব্যস্ত করতে পারবে না। এমতাবস্থায় বিবাহের পর মহর ধার্য করতে হবে নতুবা মহরে মিসিল প্রদান ওয়াজিব হবে।

মহর পরিশোধের দায়িত্ব কার

স্ত্রীর প্রাপ্য মহর পরিশোধের দায়িত্ব স্বামীর উপর বার্তায়। অবশ্য পাত্রের কোন নিকটাত্মীয় তার পক্ষ থেকে শোধ করে দিলে পরিশোধ হবে।

ধর্মতঃ ও আইনতঃ যেহেতু মহর আদায়ের দায়িত্ব স্বামীর; কাজেই বিয়ের সময় মহরের ব্যাপারে পাত্রের আর্থিক যোগ্যতার বিষয় ও তার মতামত নিয়ে সংগত পরিমাণ মহর নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। আজকাল যেভাবে উভয় পক্ষের মুরব্বীগণ মহর নির্ধারণ করেন, যা (স্বামী-দাতা+স্ত্রী-প্রাপক) মূল পক্ষদ্বয় জানতেও পারে না এবং তাদের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনও অনুভব হয় না। এ ব্যবস্থা শরীয়াত সম্মত নয় এ থেকে সমাজে এ ধারণার উদ্ভব হয়েছে যে, মহর আদায় করতে হবে না। কিংবা স্বামী বিবাহ কালেই নিয়্যত করে নেয় মহর আদায় করবে না। এভাবে যদি শুধু লৌকিকতার খাতিরে লক্ষ লক্ষ টাকা মোটা অংকের মহর বাধা হয়, তবে তা নিছক ধাপ্পা এবং প্রতারণা হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। দাম্পত্য বন্ধনের সূচনাতেই এহেন প্রতারণা ও ধাপ্পা অকল্পনীয়। প্রতারণা করার জন্য কোরআনের আয়াত নাযিল করে মহরের ফরয বিধান করা হয়নি। এজন্য ইসলাম সাধ্যাতীত মোটা অংকের মহর পছন্দ করে না।

মহর সম্পর্কে আদর্শ স্ত্রীর ভুল ধারণা

মহর সম্পর্কে আমাদের মুসলিম সমাজে বেশ কিছু কুসংস্কার ও কু-প্রথার প্রচলন রয়েছে। আমাদের সমাজের অধিকাংশ বধূ মহরের গুরুত্ব, তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুই জানে না। ফলে বিষয়টিকে বিয়ের সাথে একটি রসম ও প্রথা বলে মনে করে, যা গুরুত্বহীন। ফলশ্রুতিতে বধূরা 'মহর' থেকে বঞ্চিতা হয়। পিতা-মাতার উত্তারাধিকার থেকে বঞ্চিতা হয়ে, স্বামী, সমাজ কর্তৃক নিগৃতা, পরিত্যাক্তা হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। ফুটপাতে, পুতি গন্ধময় বস্তীতে, নিষিদ্ধ পল্লীতে বঞ্চিতা নারীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ; মানবাধীকার সংস্থা এমনেষ্টি ইন্টার ন্যাশনাল একবার রিপোর্ট দিয়েছিল, বাংলাদেশে পতিতা বৃত্তিতে নিয়োজিত আছে ২০ লক্ষ মহিলা। এদের সাক্ষাতকার নিলে জানা যেত যে, কত সংখ্যক মহিলা তাদের শারীয়াঃ নির্ধারিত হক থেকে বঞ্চিতা হয়ে জাহান্নামের এ রাস্তায় পা

বাড়িয়েছে। দুর্ভাগ্যের ও চরম কলংকের এ অবস্থা থেকে মেয়েদের বাঁচানোর জন্য তাদেরকে তাদের প্রাপ্য অধিকার ও হক সম্পর্কে সজাগ, সচেতন করা ও জ্ঞান দান করা দরকার। মহর একটা মেয়ের অর্থনৈতিক অগ্রীম নিরাপত্তা। সংকটকালে সে যেন এ সম্পদ ব্যবহার করে সম্মানজনকভাবে জীবন যাপন করতে পারে, তার জন্যে এ ব্যবস্থা।

বাহ্যতঃ মেয়েরা জন্ম থেকে সংসারে বড় হয়; বাবা/ভাইরা তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে। বিয়ে হলে সে দায়িত্ব স্বামীর। স্বামী বিহনে ছেলে সন্তানদের দায়িত্ব। কিন্তু এমন একটা অবস্থা হতে পারে, যখন তার বাবা, ভাই নেই; থাকলেও তারা দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম।

স্বামী মারা গেছে অথবা স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা হয়েছে। ছেলে সন্তান নেই, আর থাকলেও দায়িত্ব নেয় না বা নিতে অক্ষম। এহেন অবস্থায় একজন নারী যেন পথে নামতে না হয়, সেজন্য ইসলাম মহর, পিতার সম্পদের ভাগী, মায়ের সম্পদের ভাগী, স্বামীর সম্পদের ভাগী, ছেলের সম্পদের ভাগী, ভাইয়ের সম্পদের ভাগী করেছে। তারপরও সমস্যা হলে ইসলাম সরকারের উপর তার দায়িত্ব অর্পণ করে। যেমনটি-রাসূল (সাঃ) ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি ঋণ বা অসহায় স্ত্রী, সন্তান রেখে মারা গেল; তার ঋণ পরিশোধ ও স্ত্রী, সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার সরকারের উপর। উক্ত অধিকারগুলো যথাযথভাবে একজন মেয়ে বুঝে পেলে, সংকটখালে তাকে পথে নামতে হবে না। সে সম্মানজনক জীবন যাপন করতে পারবে। কিন্তু আমাদের সমাজে এর যথাযথ বাস্তবায়ন না থাকায় কত নারী যে বঞ্চিতা, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা হয়ে নিরুদ্দেশ হচ্ছে, কত যে হারিয়ে যাচ্ছে, সভ্য সমাজ থেকে নেমে যাচ্ছে অন্ধকার জীবনে; কত যে ফাঁসীর মালা বরণ করে নিচ্ছে, কত মা বোন যে খুনের শিকার হচ্ছে তার পরিসংখ্যান কেউ বলতে পারবে না। জাতির অর্ধেক নর; অর্ধেক নারী। নারীর অধিকার লংঘিত হলে নরের শান্তি দুরাশা মাত্র। আমার বোন/মেয়ে কষ্ট পেলে আমি শান্তিতে থাকব কি করে ভাবা যায়? তাই মেয়েদের অধিকার সচেতন করে গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। নারী যেন স্বামীর নিকট থেকে তার শারীয়াঃ নির্ধারিত হক আদায় করে নেয়। এখানে লোকোচুরি বা লজ্জার কিছু নেই। এটা তার আইন সম্মত অধিকার।

মহর নিয়ে প্রতারণার কৌশল

আমাদের সমাজে মহর নিয়ে নানা রকম কুসংস্কার আছে। এর একটি হচ্ছে–স্ত্রীর কাছ থেকে ছলে বলে, কলে-কৌশলে মাফ চেয়ে মহর মাফ করিয়ে নেয়া।

দেশের কোন কোন অঞ্চলে এ কু-প্রথা চালু আছে যে, বিয়েরে রাতেই স্ত্রীর কাছ থেকে মহর মাফ করিয়ে নেয়া। দাদা, নানা, ভগ্নিপতি দাদী, নানীরা শিখিয়ে দেন বরকে, প্রথম রাতেই মাফ চেয়ে নিও। ফলে (ক) অভিভাবক মনে করেন মহর মোটা অংকের নির্ধারিত হলে কি হবে ছেলে মাফ চেয়ে নিবে অথবা না দিলেও চলবে। এই নির্ভরতায় মোটা অংকের মহর মেনে নেন। (খ) ছেলে শেখানো পথে মাফ চেয়ে নেয়। (গ) মেয়ে যেহেতু মহরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং প্রথম প্রথম সে মানসিক ভাবে দুর্বল থাকে এবং অতি স্বাভাবিক ভাবেই সেই সময়ে সে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়ার অবস্থা ও অবস্থানে থাকে না। এহেন অবস্থায় সে তার স্বামীকে মাফ করবে না, তা বলতে পারে না। (ঘ) বাসর রাতে আবেগ উচ্ছাস আর স্বামী নামক স্বপ্নের রাজপুরুষ, হৃদয় রাজ্যের প্রাণ পুরুষ, সারা জীবনের সংগী যখন মহর মাফ চায়, তো সে রেওয়াজ মোতাবেক মাফ করে দেয়ার সম্মতি দেয়। সে বুঝতে পারে না যে, এ ভালবাসা, আবেগ আর উচ্ছাস স্থায়ী নাও থাকতে পারে। মহর নিয়ে এরূপ নাটক করার জন্য আল্লাহ কুরআনের আয়াত নাযিল করে মহর ফরয করেননি; বরং পরিশোধযোগ্য করেছেন।

মহর মাফ করিয়ে নিলে কি কি ক্ষতি হয়

(১) কুরআনের ফরজ অধিকার নিয়ে তামাশা করার জন্য সমাজ হয় পাপিষ্ট।
(২) মানুষ হয় প্রতারক, ধোকাবাজ।
(৩) বর প্রথম রাতে স্ত্রীর কাছে মাফ চেয়ে পৌরষত্বের চরম অপমান করে।
(৪) নারীরা হয় বঞ্চিতা, অধিকার হারা।
(৫) স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।
(৬) দাম্পত্য জীবনে আসে অশান্তি।
(৭) পরিবারে সৃষ্টি হয় ভাঙ্গন।
(৮) সমাজে নেমে আসে বিপর্যয়।

(৯) রাষ্ট্রে দেখা দেয় বিশৃংখলা।
(১০) শিশু সন্তানেরা হয় নীড় হারা পাখির মতো। মা-বাবা ও পরিবারের আপন জনের আদর ও সোহাগ থেকে বঞ্চিত, নাম হয় টোকাই, আর পথকলি। সুতরাং মানবতার সার্থে এ প্রবণতা রোধ করা প্রয়োজন।

ফকীহগণ বলেছেন, মহর মাফ চেয়ে নিলে, অথবা ছলে-বলে, কৌশলে বা চাপ প্রয়োগে মাফ করিয়ে নিলে মাফ হবে না।

কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ "আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহর সেচ্ছায় খুশি মনে দিয়ে দাও। তারা যদি খুশি হয়ে কিঞ্চিত ছাড় দেয়; তবে তা তোমরা সাচ্ছন্দে ভোগ কর। সূরা-৪ঃ৪

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর-ই-মা'আরিফুল কুরআনে মুফতী শফি (রহঃ) লিখেছেন যে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর জবরদস্তী করে ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে মহরের অংশ বিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরি ভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তা তোমাদের জন্য ভোগ করা জায়েয হবে। এর পূর্বে স্ত্রীর সম্পদে যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ অবৈধ।

এ ধরণের বহু নির্যাতনমূলক প্রথা জাহেলিয়্যাতের যুগে প্রচলিত ছিল। কুরআন এসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও মুসলিম সমাজে 'মহর' সম্পর্কিত এ ধরণের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়। কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এ ধরণের নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। আয়াতে হৃষ্ট চিত্তে মহর প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মহর স্ত্রীর অধিকার এবং তা নিজস্ব সম্পদ। হৃষ্ট চিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে তাহলে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদে হস্তক্ষেপ করা কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাদীসে শারীয়তের মূল নীতিরূপে ইরশাদ করেছেন ঃ

"সাবধান, জুলুম কর না। মনে রেখ, কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না। -মিশকাত/২৪৫।

এ হাদিসটি এমন একটি মূলনীতির নির্দেশ দেয়, যা সর্ব প্রকার প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল ও হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে। তাই মাফ করিয়ে নেয়ার জঘন্যতম কু-প্রথা পরিহার করা প্রতিটি সুস্থ বিবেকবান মুসলমানের কর্তব্য।

মহর মাফ করিয়ে নেয়ার এক অমানবিক পন্থা

প্রাসংগিক একটা বিষয় যা উল্লেখ না করলেই নয়। দেশের কোন কোন এলাকায় কু-প্রথা আছে যে, স্বামী মারা গেলে কিছু নিকটাত্মীয় মাতব্বর, কোন কোন মসজিদে দুর্বল ইমাম সাহেবসহ বিধবা স্ত্রীর কাছে দল বেধে উপস্থিত হয়ে বলেন, মহরের দাবী মাফ করে দাও, নতুবা স্বামীর কবরে আযাব হবে।

লক্ষ্য করুন, একজন মহিলার জীবন সঙ্গী মারা গেছে। সে এখন অসহায়, বিধবা, তার সন্তানেরা এতীম, বুকফাটা আর্তনাদ, আর আপন হারানোর বেদনায় মুহ্যমান। এমনি এক নাজুক সময়ে মুরব্বী, আত্মীয় ও ইমামের প্রস্তাবনা........মহর মাফ না করলে কবরে আযাব হবে! প্রবঞ্চনার কি বিভৎস রূপ? একটা নারী তার সবচাইতে আপন মানুষটির লাশ সামনে নিয়ে, এতীমদের পাশে নিয়ে শোকে কাতর। এখন তার সামনে প্রস্তাবনার দুটি দিক। এর যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে হবে। (১) হয় মহর মাফ করতে হবে, নতুবা (২) স্বামীর কবরের আযাব মেনে নিতে হবে।

এমনি এক মুহুর্তে উক্ত রূপ প্রস্তাবনাকে অগ্রাহ্য করে কোন মহিলা কি মহর মাফের স্বীকৃতি না দিয়ে পারে? অথচ এটা একটা ভিত্তিহীন বক্তব্য, বানোয়াট প্রথা, জঘন্যতম বিদআত। নারীকে তার শরীয়া নির্ধারিত হক্ব থেকে বঞ্চিত করার এক অমানবিক কৌশল। সুতরাং দেশের কোন অঞ্চলে যেন এরূপ প্রথা চলতে না পারে, সে জন্য সকল নারী পুরুষকে সচেতন ভূমিকা পালন করা একান্ত আবশ্যক।

নব স্ত্রীকে কেন মহর দিতে হবে

মহা মহিম আল্লাহ তা'আলা মহা গ্রন্থ আল-কুআনের সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

"পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের মর্যাদা দান করেছেন। এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।" সূরা ৪ঃ৩৪

আল্লাহপাক কুরআন মাজীদের উক্ত আয়াতে পুরুষকে কর্তা বা তত্ত্বাবধায়ক ও (স্ত্রীর ভরন-পোষণের জন্য) সম্পদ ব্যয়কারী বলে অভিহিত করেছেন।

যদিও বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় উভয় পক্ষের সমতা, সম্মতি ও আগ্রহের ভিত্তিতে, তবুও দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের উপর ইসলাম অধিকতর দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা অর্পণ করে। এক দিকে যেমন স্বীয় স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির খোরপোশ, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে স্বামী আইনতঃ ও নীতিগতভাবে বাধ্য, অপরদিকে সারাজীবনের জন্য স্ত্রীকে একান্তভাবে তার জন্য হালাল এবং অপরের জন্য হারাম করে নেবার এ বৈবাহিক সম্পর্কের বিনিময়ে একটি যুক্তি সঙ্গত পরিমানের অর্থ বা সম্পদ "মহর" রূপে স্ত্রীকে প্রদান করতেও স্বামী বাধ্য থাকে। কুরআন মাজীদ নারীকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে তাকে যে সকল অধিকার প্রদান করেছে, তন্মধ্যে 'মহর' অন্যতম।

পূর্বে নারী ছিল কেবলই পুরুষের ভোগের সামগ্রী এবং সাধারণ তৈজষপত্রের মত, তার স্বতন্ত্র মানবসত্তা ছিল না। নারী কোন সম্পদের মালিক হতে পারত না। কারণ, সে ছিল নিজেই সম্পদ সম। পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তে নারীর মানব স্বত্ত্বা স্বীকৃত এবং মহরের ব্যবস্থা থাকলেও পৃথিবীর প্রায় সকল সম্প্রদায় সে শিক্ষা ভুলে গিয়েছিল। শারীয়ত-ই মুহাম্মদিয়্যাঃ পুনরায় নারীর বহুবিধ অধিকারের মধ্যে মহরের ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল এবং এর বিস্তারিত বিধান দিল।

স্ত্রীর প্রাপ্য মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ কতটুকু

মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পর্কে আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনদের মতবিরোধ রয়েছে, ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন এক চতুর্থাংশ দিনার বা ৩ দিরহাম। ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) মতে ১ দিনার বা ১০ দিরহাম। ইমাম আবু হানিফার মতের সমর্থনে দারাকুতনীও বায়হাক্বীতে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস আছে। যাতে মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ ১০ দিরহাম বলে

উল্লেখ আছে। হাদীসটি উক্ত সনদে দুর্বল হলেও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ায় দুর্বলতা বহুলাংশে অপসারিত। এছাড়া ইবনে আবী হাতিমের বর্ণনায় এটা হাসান বা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পৌঁছেছে। হাফিজ ইবনে হাজার (রঃ) ও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। এছাড়াও হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন-

"দশ দিরহামের কম মহর হতে পারে না।"

হযরত ইবনে ওমরসহ বহু সাহাবী থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের আর্থিক দৈন্যের দিকে লক্ষ্য করে ৩ (তিন) দিরহাম পরবর্তীতে তা ১০ দিরহামে উন্নীত হয়। এরূপ ব্যাখ্যায় উল্লেখিত দুই মতের সামঞ্জস্য সম্ভব।

বর্তমানে ১০ দিরহামে কত টাকা হয়

বিশিষ্ট মুহাক্কিক, আলেম, বুযুর্গ হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ সাহেব (রাহঃ) স্বীয় গ্রন্থ আহসানুল ফাতাওয়াতে লিখেছেন যে, ১ দিরহাম= ৩,৪০৩ গ্রাম রূপা। অতএব ১০ দিরহাম= ১০×৩.৪০৩= ৩৪.০২ গ্রাম রৌপ্য। এর বর্তমান বাজার মূল্য যা, তাই ১০ দিরহামের বর্তমান পরিমাণ। (২০/৪/৯৮ইং) এর বাজারদর ১৬.৮৮ টাকা গ্রাম হিসেবে= ৩৪.৪০৩×১৬.৮৮=৫৭৪.২৬ পয়সা।

তবে মহর যদি ১০ দিরহামের কম নির্ধারণ হয়, তাহলে ৩৪, ০২ গ্রাম রূপার চলতি বাজার মূল্য প্রদান করা (হানাফী মাজহাব অনুযায়ী) ওয়াজিব।

স্ত্রীর প্রাপ্য মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণ কত

শাশ্বত ইসলামী শরীয়ত নারীর বৈবাহিক, অর্থনৈতিক অধিকার মহরের সর্বোচ্চ পরিমাণের কোন নির্দিষ্ট সীমা বাতলে দেয়নি। তবে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর সকল দেশে মানুষের জীবন মান সমান নয়। সকলের অর্থনৈতিক অবস্থা, সংগতি ও ইনকাম সমান নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণেই দেখা যায় কারো এক বছরের রোজগার যা হয়, কেউ তা ১ দিনে উপার্জন করে। বিত্তশালী এক ব্যক্তি একদিনে যা ব্যয় করে, একটা গরীব পরিবার সারা বছরে তা ব্যয় করার সক্ষমতা রাখে না। মানুষের জীবন যাপন এবং রুচিতেও তাই পার্থক্য হয়। একজন

আলীশান ভবনে অপর জন কুড়ে ঘরে দিনাতিপাত করে। কারো জন্য উড়োজাহাজে দেশ ভ্রমণ স্বপ্নের ব্যাপার। আর কারো জন্য ডালভাত। সেমতে অর্থ সম্পদের ক্ষেত্রে এক জনের জন্য যা কল্পনা বর্হিভূত; অপরজনের জন্য তা সাধারণ পরিমাণ। তাই ইসলামী শরীয়াত সর্বনিম্ন মহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিলেও সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করেনি।

এটা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের দাবী। এটাই যুক্তিসংগত, বুদ্ধি বৃত্তিক ও বিজ্ঞান সম্মত। কারো কোটি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স আছে। আবার কেউ বা শত টাকার ঋণের বোঝা সইতে পারে না। এ অবস্থায় সমান সমান অথবা একটা পরিমাণ নির্ধারিত করে দিলে ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষ মজলুম হত, আর ক্ষেত্র বিশেষে নারী বঞ্চিতা হত। এজন্য ইসলামী শরীয়াঃ সর্বোচ্চ মহর নির্ধারণ করেনি।

মহর নিয়ে সামাজিক ভ্রান্তি

চলমান সমাজ ব্যবস্থায় মহর নিয়ে অনেক ভ্রান্তি বিদ্যমান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'মহর' হয় কম নির্ধারণের চেষ্টা চলে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ মহরের দোহাই দিয়ে অথবা বেশি নির্ধারণের চেষ্টা চলে পারিবারিক ইমেজ, বংশের মর্যাদা বৃদ্ধির আশায়। অথচ এটা একটি ভুল ও প্রচলিত ভ্রান্তি। বরের সাধ্য ও সঙ্গতি অনুযায়ী উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য একটা পরিমাণ 'মহর' নির্ধারণ হওয়া উচিত।

অনেক সচ্ছল বর আছেন, যার মুরব্বীরা মহর নির্ধারণের ক্ষেত্রে মহরে ফাতেমীর দোহাই দেন এবং বরের সাধ্য ও সক্ষমতার চেয়ে অনেক কম মহর নির্ধারণ করেন। এটা সঙ্গত নয়। যদিও কম নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা নেই, তথাপি এক্ষেত্রে নীতিমালা হচ্ছে সঙ্গতি ও সাধ্য অনুযায়ী 'মহর' নির্ধারণ হবে। তা না হয়ে কম হলে পরোক্ষভাবে কনেকে (বধূকে) আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। সে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিতা হয়। অথচ ফিকহের কিতাবাদীতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ 'মহর' নির্ধারণকে বাধ্যতামূলক বা উৎসাহিত করা হয়নি।

পক্ষান্তরে অযৌক্তিক মাত্রাতিরিক্ত মহর নির্ধারণের প্রবণতাও দেশের কোন কোন অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। বর বা ছেলের যা দেয়ার আদৌ সাধ্য নেই, তার উপর একটা অযৌক্তিক মোটা অংকের মহর চাপিয়ে দেয়া হয়।

একজনের মাসিক ইনকাম ৪০০০/- টাকা। বছরের ৪০০০×১২=৪৮০০০/ টাকা। খরচ বাদে তার কাছে বছরে ২,০০০/- টাকা সঞ্চিত হয় না। এ রকম এক ছেলের 'মহর' নির্ধারণ করা হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা; এটি একটি উদাহরণ। উভয় পক্ষের মাতব্বরগণ মহর নির্ধারণ করেন। একবারও চিন্তা করেন না যে, ছেলেটির বর্তমান আয় অনুসারে মোটা অংকের মহর আদায়ের সাধ্য তার আছে কি না? ছেলের সাথে আলাপ করারও প্রয়োজন বোধ করেন না, অথচ ছেলেকে মহর আবশ্যিকভাবে আদায় করতে হবে।

সুতরাং সামাজিক এই ভ্রান্তি থেকে উত্তোরণ ও পরিত্রাণ দরকার। সমাজের সকল মানুষ বিশেষতঃ যারা অভিভাবক, তাঁদের আরো সচেতন ভাবে ভূমিকা পালন করা দরকার। একই সাথে যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন, তাদের এ ক্ষেত্রে জাগ্রত ভূমিকা কাম্য। এতে লজ্জার কিছু নেই। অনায়াসে বর বলতে পারে, আমার এত টাকার বেশি 'মহর' দেয়ার সাধ্য নেই। সমাজে এক্ষেত্রে সচেতনা আসলে উক্তরূপ ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারে।

মহরে ফাতেমী কত ছিল

যখন হযরত আলীর (রাঃ) সাথে হযরত ফাতিমার (রাঃ) বিবাহ হল, তখন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আদরের দুলালী হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে ৪৮০ দিরহাম দেন মহর ধার্য করে বিবাহ দিলেন।

নবীজী (সাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি যেন ফাতিমাকে আলীর কাছে বিয়ে দেই। আমি ৪০০ মিসকাল রূপার দেন মহরে ফাতেমাকে বিবাহ দিলাম।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "নবী কারীম (সাঃ) আমাকে বললেন? তোমার কোন অর্থ সম্পদ আছে কি? (যা দিয়ে ফাতিমার মহর আদায় করবে) আমি আরজ করলাম, আমার একটি ঘোড়া ও (যুদ্ধের) ঢাল আছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঘোড়ার জরুরী প্রয়োজন আছে তোমার। তবে ঢালটি বিক্রি করে দাও। অতঃপর আমি ৪৮০ দিরহামে ঢাল বিক্রি করলাম এবং তা নিয়ে নবী সাল্লাল্লামু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাজির হলাম।"

বুঝা গেল, হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর 'মহর' এর ব্যাপারে দুটি মতামত আছে। একটি হচ্ছে ৪৮০ দিরহাম। অপরটি হচ্ছে ৪০০ মিসকাল চান্দী।

প্রথমোক্ত পরিমাণ বিভিন্ন হাদীস এর ও সীরাতের কিতাবাদী দ্বারা প্রমাণিত। ২য় বর্ণনাটি কেবল 'তারীখে খামীস' এর। সুতরাং ১ম বক্তব্য অগ্রগণ্য।

উল্লেখ্য যে, ৪৮০ দিরহামের বর্তমান পরিমাণ কত? তা নিয়ে ফক্বীহদের মতভেদ আছে। আহসানুল ফতোয়া অনুযায়ী ৪৮০ দিরহাম×৩.৪০৩ গ্রাম= ১৬৩৩.৪৪ গ্রাম রৌপ্য।

যার (২০/০৪/৯৮ইং তাং বাজার দর ২৭.৫৭২.৪৭ টাকা (প্রতি গ্রামের মূল্য= ১৬.৮৮×১৬৩৩.৪৪= ২৭.৫৭২৪৭ টাকা) আবার অন্যান্য কিতাবে বর্তমান পরিমাণ সম্পর্কে ৩টি বক্তব্য পাওয়া যায়।

(১) ১৩১ তোলা রূপা

(২) ১৩৫ তোলা রূপা

(৩) ১৫০ তোলা রূপা

যার বর্তমান বাজার ৯৮ সনে ২০০ টাকা তোলা হিসেবে

(১) ১৩১×২০০= ২৬,২০০/-

(২) ১৩৫×২০০=২৭০০০/-

(৩) ১৫০×২০০=৩০,০০০/-

মহর আদায় করা স্বামীর উপর ফরয

মহর এটা স্ত্রীর এমন হক, যা আদায় করা স্বামীর উপর নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের মতই ফরয। অনেক পুরুষরাই এটা জানে না। সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

"(পূর্বোক্ত হারাম বিবিগণ ব্যতীত) অন্য সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এভাবে যে, তোমরা সম্পদের বিনিময়ে (অর্থাৎ মহর প্রদান করে) তাদেরকে লাভ (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ) করতে চাইবে। যৌন পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে, দৈহিক কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নয়। আর যে অর্থ বা সম্পদের বিনিময়ে তোমরা তাদের সাথে সঙ্গত হও, তাদেরকে সেই নির্ধারিত বিনিময় (ফরীযা) প্রদান কর।

এ বিষয় ভিত্তিক অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"তোমরা হৃষ্ট চিত্তে (উপহার স্বরুপ) স্ত্রীদের 'মহর' পরিশোধ কর।"

সূরা নিসা ঃ আ ঃ ৪

কুরআনের বহু আয়াতে উজুরাহুন্না শব্দের ব্যবহারে 'মহর' প্রদানের তাকিদ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ফকীহগণ শরীয়ত সম্মত বিবাহের জন্য 'মহর' প্রদান ফরজ বলে নির্দেশ করেছেন।

এক্ষেত্রে আমাদের সমাজে অনুভব ও বাস্তবায়নের ত্রুটি সুস্পষ্ট। অধিকাংশ লোক গতানুগতিক ধারায় বিষয়টিকে গ্রহণ করে। সে জন্য অত্যাবশ্যক ও ফরয মনে করে মহর আদায়ের প্রক্রিয়া সচরাচর দেখা যায় না। ফলে নারী সমাজ স্রষ্টা নির্ধারিত একটি হক থেকে বঞ্চিতা থেকে যান।

মহর আদায়ের সাক্ষী বা লিখিত দলীল রাখার প্রয়োজন আছে কিনা

বর্তমানে মহর রেজিঃ করণের ব্যবস্থা আছে। রেজিঃ না হলেও অনেকের সামনে সাক্ষীতে বিবাহ শাদী সম্পন্ন হচ্ছে, এতে নগদে যা আদায় করা হয়, তা নিয়ে সাধারণতঃ সমস্যা বাধে না। বাকীতে যা থাকে, তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা না হলে বা বিচ্ছেদ হলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। ক্ষেত্র বিশেষে স্বামী পূর্ণ/অংশ বিশেষ আদায়ের দাবী করে; আর স্ত্রী অস্বীকার করে; এ রকম ঘটনা যেহেতু ঘটে, তাই মহরানা আদায়ের ক্ষেত্রে স্বাক্ষী/ লিখিত দলীল রাখাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, আইন আদালতে দলীল ছাড়া স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও সে আদায় করে থাকলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সে দায়-দেনা মুক্ত। কিন্তু দুনিয়ার আদালতে স্বাক্ষী প্রমাণ জরুরী। সুতরাং এ বিড়ম্বনা থেকে বাঁচার জন্য স্বাক্ষী/লিখিত প্রমাণ রাখা বাঞ্ছনীয়। আর লেন-দেনের ক্ষেত্রে কুরআনে কারীমের নির্দেশও তাই।

নির্জনবাসের পূর্বে তালাকের ক্ষেত্রে মহর প্রাপ্তি

(১) মহর নির্ধারিত না হলে স্ত্রী মহর পাবে না। তবে বিধান অনুযায়ী 'মাতা' (কিছু উপহার সামগ্রী) পাবে। এক্ষেত্রে তাকে উদ্দত পালন করতে হবে না।

উল্লেখ্য যে, 'মাতা' বরের সামর্থ অনুযায়ী হবে, তবে কমপক্ষে এক প্রস্থ বা সেট পোষাক (তিনখানা যথাঃ সেলোয়ার, কামিস ও চাদর মধ্যম মানের বস্ত্র) প্রদান ওয়াজিব।

(২) নির্ধারিত হলে স্ত্রী অর্ধেক মহর পাবে। এবং তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না।

(৩) তবে নির্জন বাসের পূর্বে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী সম্পূর্ণ মহর প্রাপ্য হবে।

নির্জন বাসের পর-তালাকের ক্ষেত্রে মহর প্রাপ্তি

স্বামী স্ত্রীকে নির্জন বাসের পর তালাক প্রদান করলে (এক) নির্ধারিত না হয়ে থাকলে স্ত্রী বিধান মোতাবেক মহরে মিসিল পাবে। ইদ্দত পালন করবে। এবং স্বামীর পক্ষ থেকে খোরপোষ পাবে। (দুই) মহর নির্ধারিত থাকলে স্ত্রী সম্পূর্ণ মহর পাবে। ইদ্দত পালন করবে এবং বিধি মোতাবেক খোরপোষ পাবে।

নির্জন বাসের পর তালাক হলে মহর পরিশোধ

নির্জন বাসের পর তালাক সংগঠিত হলে সম্পূর্ণ মহর তৎক্ষণাত পরিশোধযোগ্য হবে।

সাধ্য ও সক্ষমতা থাকলে মোটা অংকের 'মহর' হতে পারে

মহরের সর্বোচ্চ কোন পরিমাণ নির্ধারিত হয়নি। এটাই ফক্বীহগণের সর্বসম্মত মত। অতঃপর সক্ষমতা থাকলে যত অধিক ইচ্ছা মহর র্নিধারণ করা যায়, এর প্রমাণস্বরূপ কুরআন মজীদের আয়াত পেশ করা হয়। যার অর্থ এই–'আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে (অর্থাৎ এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তদস্থলে) অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং যদি তাকে (পূর্বোক্ত স্ত্রীকে) মহর স্বরূপ বিপুল পরিমাণ মাল (কিনতার) প্রদান করে থাক, তথাপি তা থেকে সামান্য অংশও ফেরত নিও না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে? সূরা -৪-২০

কিনতারের অর্থ হচ্ছে বিপুল পরিমাণ সম্পদ। হযরত উমর (রাঃ) মহরের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করতে চেয়েছিলেন। উক্ত আয়াতের ভিত্তিতে আপত্তি উঠলে তিনি সে আপত্তি মেনে নেন এবং তার মত পরিবর্তন করেন। ঘটনাটি কিতাবে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে-

"হযরত উমর (রাঃ) মসজিদের মিম্বরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহর সম্পর্কে বললেন, তোমরা মহিলাদের মহর নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।

(অর্থাৎ মোটা অংকের মহর নির্ধারণ থেকে বিরত থাক) এর প্রেক্ষিতে জনৈকা মহিলা আপত্তি তুলে বললেন, 'আমরা আপনার কথা মানব, নাকি আল্লাহর কথা (তোমরা যদি একজনকে বিপুল সম্পদ ও মহর দিয়ে থাক) মানব'? হযরত উমর (রাঃ) প্রত্যুত্তরে বললেন, সকলে উমরের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। সুতরাং বিয়ে শাদী সম্পন্ন কর, যে পরিমাণের উপর তোমরা সম্মত হও'।

এতে বুঝা গেল যে, স্ত্রীকে মহর হিসেবে প্রচুর মাল সম্পদ দেয়া বৈধ। তবে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মহর নগদ প্রদানের স্বার্থে স্বামীর আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী ধার্য করা বাঞ্ছনীয়।

নববধূর মহর নগদে পরিশোধ করা সুন্নত

ইসলামী বিধানে একদিকে স্বামীর আর্থিক সামর্থ, অপরদিকে স্ত্রীর গুণাবলী ও সামাজিক মর্যাদা দৃষ্টে 'মহর' নগদ প্রদান করা সুন্নাত এবং হযরত (সাঃ) ও তাঁর সাহাবী (রাঃ) গণ 'মহর' আদায় করেছিলেন। হযরত ফাতেমার (রাঃ) মহর নগদ আদায় করা হয়েছিল, সেই বর্ম বিক্রি করে। এক আনসারী মহিলার স্যাথে বিবাহের পর প্রসিদ্ধ সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) যখন হযরত (সাঃ) সমীপে আসলেন, তো হযরত (সাঃ) তাঁর কাছে মহরের পরিমাণ জানতে চাইলেন। উত্তরে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বললেন, খেজুরের একটি গুটি পরিমাণ স্বর্ণখন্ড দিয়েছি।

নগদ মহর প্রদানের তাকীদেই পূর্বোক্ত দরিদ্র সাহাবীকে একটি লোহার আংটিও যদি পাওয়া যায়, খুঁজে আনতে রাসূল (সাঃ) আদেশ করেছিলেন।

নবুওত লাভের প্রায় ১৫ বৎসর পূর্বে হযরত খাদিজার সাথে হযরত (সাঃ) এর বিবাহে মহর প্রদত্ত হয়েছিল। সুতরাং মহর নগদ প্রদানই শরীয়তের বিধান।

মহর নগদ পরিশোধের দ্বারা সমাজে চালু হলে ইত্যকার অনেক সমস্যা, কুসংস্কার থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। মাত্রাতিরিক্ত মহর নির্ধারিত, মহরনা দেয়ার মনোভাব এবং স্বামী স্ত্রী ও বিবাহ পরবর্তী অমিল বা বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে মহর নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় তারও অবসান হবে। সর্বোপরি শরীয়তের বিধানের যথাযথ বাস্তবায়ন হবে।

মহর বা উপহার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মত পার্থক্য দেখা দিলে

সমস্যা ঃ স্বামী বিভিন্ন সময়ে স্ত্রীকে রকমারী সামগ্রী দিয়েছে। পরে সে বলল যে, এগুলি মহর হিসেবে বা পাওনা মহর থেকে দিয়েছে। পক্ষান্তরে স্ত্রী দাবী করল, তা মহর নয়; বরং উপহার অথবা স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত খোরপোষের অন্তর্ভূক্ত। এমতাবস্থায় সমাধান কি?

সমাধান ঃ (১) বিশেষ খাদ্য সামগ্রী এবং যেসব বস্তু সামগ্রী সাধারণতঃ উপহার হিসেবে দেওয়া হয়, সে সমস্ত সামগ্রীর ব্যাপারে স্ত্রীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। যথা– কাপড়-চোপড় অন্যান্য বস্তু সামগ্রী।

(২) সাধারণত ঃ যেসব বস্তু সামগ্রী উপহার হিসেবে দেয়া হয় না এবং স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদানের আবশ্যিক কর্তব্যের আওতায় পড়ে না, সে সব বস্তু সামগ্রীর ক্ষেত্রে উপহারের দাবী গ্রহণ যোগ্য নয়।

তবে স্ত্রী যদি আবশ্যিক প্রদেয় খোরপোষের অন্তর্ভূক্ত বলে দাবী করে আর স্বামী মহরের এবং এহেন মতানৈক্য উপভোগ্য সামগ্রী নষ্ট হবার পরে হয়, তবে স্ত্রীর বক্তব্য অগ্রগণ্য হবে। আর বস্তু সামগ্রীর স্থিতিকালে মতানৈক্য হলে এক্ষেত্রে দুটি মত পাওয় যায়।

✺ ফকীহ্ আবুল-লাইস (রহঃ) এর মতে উক্ত অবস্থায় স্ত্রীর কথা গ্রহণ যোগ্য হবে। এবং এমতই গ্রহণযোগ্য।

মহর প্রদানে মধ্যপন্থা অলম্বন করা সুন্নাত

নবী করীম রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খরচ খরচার বিবেচনার সহজতম বিবাহই সর্বোত্তম। সুতরাং মহর হবে বরের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী। অন্যপক্ষে কুরআনুল করীমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতকে মধ্যপন্থী উম্মত রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কাজেই মহরের বেলাতেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা সুন্নাত। যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর মহর ছিল চারশত মিস্কাল পরিমাণ রৌপ্য। যে লৌহ বর্ম বিক্রয় করে হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমার এর মহর দিয়েছিলেন। এর মুল্য পাওয়া গিয়েছিল ৪৮০ দিরহাম।

উক্ত পরিমাণ মহর মধ্যপন্থা অবলম্বনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ রূপে

বিচেতি হয়। যা সে যুগের প্রেক্ষিতে পরিমাণে একেবারে স্বল্পও নয়, যাতে করে বিয়ে একটি খেলার ব্যাপার এবং কনের সত্বাকে তুচ্ছ বলে মনে হতে পারে। অপর পক্ষে এত অধিকও ছিল না, যা নগদ পরিশোধ করা অসম্ভব বা দুস্কর হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সকল ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয় হাবীব নবীজী (সাঃ) এর প্রদর্শিত নূরানী সুন্নাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। - আমীন

সমাপ্ত

প্রিয় পাঠক/পাঠিকাবৃন্দ!

আদর্শ স্ত্রীর পথ ও পাথেয় বইটি পাঠ করে হয়ত ভাল লেগেছে। ভাল লেগে থাকলে অন্য জনকে বইটি পড়তে দিন।

ধন্যবাদান্তে
গ্রন্থকার।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা!

দাম্পত্য জীবনে পদার্পন করা প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষের কর্তব্য। বিবাহের মাধ্যমে একজন অচেনা, বেগানা ও পরপুরুষের সঙ্গত্ব গ্রহণ করে তাকে আপন করে নেয়া, জীবনসাথীরূপে প্রাণের চেয়েও প্রিয় বানিয়ে নেয়া নারী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

পারস্পরিক, সাংসারিক সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধিতে একজন নববধুর ভূমিকা অপরিসীম। একজন নববধুর কারণে স্বামীর সংসার হতে পারে জান্নাত অথবা জাহান্নাম। তাই তো আমাদের সমাজে প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ হয়েছে ঃ

"সংসার সুখী হয় রমণীর গুণে।"

আর কথায় কথায় তর্ক-বিতর্ক, পদে পদে পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ, স্বামী-স্ত্রীর মন কসাকষির বদঅভ্যাস মিয়া-বিবির দাম্পত্য জীবনকে সীমাহীন দুর্বিসহ, দুশ্চিন্তাযুক্ত করে তোলে। স্বামী-স্ত্রীর সামান্য ত্রুটি, সামান্য মনোমালিন্যতা, সামান্য ভুল বুঝাবুঝি, সামান্য অসতর্কতা, অসাবধানতা ও অসংশোধনের কারণে তাদেরকে পৌঁছে দিতে পারে বিচ্ছেদ ও চির অশান্তির দ্বার গোড়ে। এছাড়াও অধিকাংশ সময় স্ত্রীর বুদ্ধিহীনতা, মুর্খতা, অসাবধানতা, তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বদ চলন, বদ মেজাজ, কর্কষ ভাষা, অসদাচরণ, দুর্ব্যবহার ও স্বামীর নাফরমানী এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে।

অধিকন্তু, কোন কোন স্ত্রীর আপন মা-বোন, ঝগড়াটে পাড়া-পর্শী ও দু'মুখীপনা মহিলাদের দেয়া কুপরামর্শ ঐ অশান্তির অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করার পরিবর্তে আরো শতগুণে প্রজ্জ্বলিত করে শান্তি নামের পায়রার নরম পেলব পাখনাগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই-ভস্ম করে দেয়। তাই এ জাতীয় সকল সংকট নিরসনের জন্য কিছু আবশ্যকীয় ইসলামী শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা মুসলিম দ্বীনদার নারীদের জন্য অপরিহার্য, যা তাদের সুখ-শান্তি ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য সহায়ক হবে। পাশাপাশি এর উপর আমলের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যতা, শাশুড়ী-বৌমার ক্ষমতা ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব, ননদ-ভাবীর হিংসা-বিদ্বেষ চিরতরে বিদায় নিবে, ইনশাআল্লাহ।

এ মহান উদ্দেশ্যেকে সামনে রেখে নববধুর জন্য বরং সকল বিবাহিতা-অবিবাহিতা নারীর জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা তাদের আগামী জীবনের জন্য হবে উপহার এবং সাংসারিক জীবনের দুর্গম পথ চলার জন্য হবে পাথেয়। তাই প্রতিটি মুসলিম নারীর দরকার–

নববধুর উপহার

গ্রন্থকার ঃ মুফতী রূহুল আমীন যশোরী

আজই এক কপি সংগ্রহ করুন।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা!

সুন্দর সাজানো গোছানো আদর্শ পরিবার ও সুশীল সমাজ উপহার দিতে প্রয়োজন একজন আদর্শ মা'র। আদর্শ মা কেমন হবে? কেমন হবে তার মন-মানসিকতা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা? কেমন হবে গর্ভ কালীন সময়ে চাল-চলন পদ্ধতি? অতঃপর সন্তান লালন-পালন ও সন্তানদের সাথে আচার-আচরণ পদ্ধতি? কেমন হবে আদর্শ সন্তান গড়ার পদ্ধতি? সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন জ্ঞান দান পদ্ধতি? এসব জানা খুবই দরকার। জানার দ্বারাই আমলের প্রেরণা জন্মাবে, আমল করবে। বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য ও আকর্ষণীয় দিকনির্দেশনার সমন্বয়-ই।

আদর্শ মা

গ্রন্থটি নিজে পড়ুন ও মা-বোনদেরকে উপহার দিন

গ্রন্থকারঃ মাওলানা মুফতী রূহুল আমীন যশোরী

বাইতুল মুকাররাম, চকবাজার ও বাংলাবাজার সহ দেশের যে কোন লাইব্রেরী থেকে আপনার কপি সংগ্রহ করুন।